লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর! দাসীকে আবার অনুরোধ কি? ছায়া কবে কায়ার আশ্রয় ত্যাগ ক'রেছে? বিদ্যুল্লতা কবে জলধরের সহবাসে বীতানুরাগিণী হ'য়েছে? জ্যোৎস্না কবে চন্দ্রমা বিরহিত হ'য়েছে? আমার আবার স্বতন্ত্র সত্বা কি আছে? আমাকে আবার মতামত জিজ্ঞাসা কেন? স্বামীসহবাসে সতীর আবার দুঃখ কি? তোমাব মতেই আমার মত, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমাব সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ, তুমিই আমার সকল সুখদুঃখের মূলাধার, আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই ঐ রাঙ্গাচরণে।

লক্ষ্মীমণি আর গৃহে প্রতিগমন করিলেন না। সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়া তিনিও স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

নানাকথা।

(সংগ্রহ)

১১। সমগ্র ইউরোপখণ্ডে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা অনূ্যন পাঁচশত সাতচল্লিশটী হইবেক।

১২। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়টী জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ছাত্র সংখ্যা নয় হাজার তিনশত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা একহাজার আটশত মাত্র।

১৩। লণ্ডনে যে সকল লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে শতকরা চল্লিশজন শীতকালে মরে। গ্রীষ্মকালে শতকরা মৃত্যু সংখ্যা বারটী মাত্র।

১৪। ফাঁসী।—আমাদের ভারতে প্রতিবর্ষে গড়ে ৭১০টী লোকের প্রাণদণ্ড হয়। বিলাতে প্রতি বর্ষে চৌদ্দ জন মাত্র চরমদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৫। কাকের ডাক অনূ্যন সাতাইশ প্রকার। প্রত্যেক প্রকার ডাকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বুঝায়।

১৬। একখানি গাভীচর্ম্মের ওজন সাড়ে সতের সের, কিন্তু একটী সমগ্র অশ্বের চর্ম্ম—কেবলমাত্র নয় সের ওজনে হয়।

মাতা-পুত্রে।

আমি একজন আইন-ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকৃতির মনুষ্যের সহিত আমায় সাক্ষাৎ ও কর্ম্ম করিতে হইযাছে। দানপত্র প্রস্তুত, বিবাহের ঘটকালি, জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করা, এই সকল আমার প্রধান কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে আমি একজন পারিবারিক আইন-পরামর্শদাতা।

আমার পিতারও এই ব্যবসা ছিল। আমি উত্তরাধিকারীসূত্রে যেমন তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয়ের অধিকারী হইয়াছি, সেইরূপ তাঁহার ব্যবসাটী গ্রহণ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হই নাই। ফ্রান্সের একটী বনিয়াদি বড় ঘরে তিনি মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎস্থানে আমিই নিযুক্ত হইয়াছি। আমার বর্ত্তমান মনিব অশীতিবর্ষীয়া এক স্ত্রীলোক, নাম মিস্ ফার্ডিনেণ্ড। এই পরিবারের কার্য্যে আমাকে এত অধিক সময় ব্যয় করিতে হইত, যে প্রত্যহই মনিব-গৃহে একবার করিয়া হাজিরা না দিলে চলিত না। অবশ্য আমি পরিশ্রমের যথা উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হইতাম।

একটী সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকায় মিস্ ফার্ডিনেণ্ড বাস করেন। তিনি তাঁহার স্বামীর দানপত্রের বলে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেও দান বিক্রয়ের তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। ফার্ডিনেণ্ড অগাধ ধনবতী, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষয় সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই উৎকর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুমহান্ সৌভাগ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র ফ্রেডারিক। ফ্রেডারিক যৌবনের মধ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সে অতিশয় জিতকামী ও জাল্মস্বভাবসম্পন্ন। তাহার এতাদৃশ চরিত্রের জন্য অনেক সময়ে অনেক কার্য্যে মাতার সহিত মতদ্বৈধ ঘটিত। চরিত্র সংশোধন না করিলে পুত্রকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ ভয় দেখাইতে মাতা কুণ্ঠিত হইতেন না।

ফার্ডিনেণ্ড চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্ব্বদাই শারীরিক ও মানসিক তুণ্ডভেদী যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। তাঁহার এবংপ্রকার অন্তর্দাহ অবলোকন

করিয়া অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ফ্রেডারিক তূর্ণ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিবে, বিশেষতঃ বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ভাবিয়াও, সে অসৎপথ হইতে মতি ফিরাইতে পারে। কিন্তু সকলের ধারণাই নিষ্ফল হইল, সে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিল। কিয়দ্দিবস পর সে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, সঙ্কল্পজন্মার অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া এক অজ্ঞাতকুলশীলা ভামিনীর নিগড় প্রেমশৃঙ্খলে নিগড়িত হইয়া আমেরিকায় তাহার পাণিগ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য, মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে এ বিবাহ করে।

এই ঘটনার পর ফার্ডিনেও আমাকে একখানা চরমপত্র প্রস্তুত করিতে অনুমতি করেন। তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, সামান্য কিছু সম্পত্তি ব্যতীত সমস্তই তিনি দাতব্য ভাণ্ডারে প্রদান করিবেন। আমি ইহার প্রতিবাদ করিলে কেবলমাত্র প্রতিক্ষিপ্ত হইলাম। বিলম্ব ভূয়িষ্ঠদীপ্ত নয়নে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়া বর্ষাকালীন নিবিড় কৃষ্ণ জলদমালার শ্রবণ ভৈরব বিকট নির্ঘোষের সদৃশ গম্ভীরভাবে তিনি বলিবেন,—

"আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। পুত্রের অত্যাচার অনেক সহ্য করিয়াছি। এখন তাহাকে পুত্র বলিতে লজ্জাবোধ হয়। সে দ্বিষ্ট, দ্বিশক। আমি অর্দ্ধপয়সাও দান করিব না। আমার মৃত্যুর পর যখন তাহাকে ভীষণ দারিদ্র্যের প্রতিকূলে অনুধাবন করিতে হইবে, তখন সে *তাহার জঘন্য বিবাহ এবং উদ্ধত স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে ও* হৃদয়ের অভ্যন্তরিণ তুষানলে দগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

ইহার পর আর বাক্য ব্যয় করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলাম।

যথাসময়ে উইল রেজেষ্টরী হইল। ইহার পাঁচ দিবস পর ফ্রেডারিক সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইসময়ে এক ভয়ানক অভিনয়ের যবনিকা পতিত হইল। মাতা কিছুতেই পুত্রকে তাহার নূতন স্ত্রীর সহিত বাড়ীতে থাকিতে দিবেন না। তিনি এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রকে তিরস্কার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ এরূপে বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার চিকিৎসক অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বার্দ্ধক্য-হেতু তিনি নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায়, চিকিৎসক তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলে তিনি

অধিকতর প্রতিক্ষিপ্ত হইলেন। যাহা হউক, গৃহের প্রান্তভাগে পুত্র বাসের নিমিত্ত একটী কক্ষ পাইল। এই ঘটনার দুইদিবস পর ফ্রেডাবিক চুরুট টানিতে টানিতে আমার বাড়ী আসিল।

অন্য দুই একটী কথাবার্ত্তার পর সে তাহাব মাতাকে শরব্য করিয়া বলিল,—

"বৃদ্ধা বড় বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিয়াছে, এমন কি আমাকে পথের ভিখারী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু আমি সোজা লোক নহি, উচিত রোগেব উচিত ব্যবস্থা আমার জানা আছে, আমি ইহার প্রতিফল নিশ্চয় প্রদান করিব।" তাহার জঘন্য কথার কোন উত্তর না দিয়াই আমি তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলাম।

পরদিবস একজন ভৃত্য আসিয়া আমাকে জানাইল যে, ফার্ডিনেণ্ড আমাকে ডাকিয়াছেন। সে আবো বলিল যে, কর্ত্রী ঐরূপ কড়া মেজাজেই আছেন। চিকিৎসক তাঁহাকে চীৎকাব এবং পদাচারণ কবিতে নিষেধ কবা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। একারণ চিকিৎসক অতিশয় ক্ষুভিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দুই একটী কথাবার্ত্তাতেই আমি তাঁহার মনোভাব টানিয়া বাহির করিলাম। তিনি বলিলেন,—

'যতক্ষণ ঐ পেত্নীটা আমার গৃহে থাকিবে, ততক্ষণ আমি স্থির হইতে পারিব না। অনুবেগ তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বলবতী আশঙ্কা দমনের আমার সামর্থ্য নাই। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণবায়ু থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আমার একার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্ব করিতে পারিবে না।

তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম, পুত্রবধূর উপরই আক্রোশটা অধিক। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ঘটনায় আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। ফ্রেডারিক্ একলা আমার নিকট আসিয়া চতুর্দ্দিকে চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এরূপভাবে কথা বলিতে লাগিল যে, তাহাতে আমার স্থির প্রতীতি হইল যে, সে উইলের কথা জ্ঞাত হইয়াছে। প্রথমে তিনি আইনঘটিত একটী বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। সে পরামর্শ আর কিছুই নহে,—আমেরিকায় তাহার স্ত্রীর বিষয়সম্পত্তি কিরূপে উদ্ধার করা যায়। তৎপর তিনি সমাগ্নাতভাবে বলিলেন,—

'বোধ হয় আপনি অবগত আছেন যে, মাতা আমার সহিত সম্প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নিতান্তই অপ্রীতিকর। কেবল চিৎকার করিয়াই চিকিৎসকের কথা অবহেলা করিতেছেন তাহা নহে, তিনি নিশিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ময়দানে কি সমীক্ষণ করিতে যান। অবশ্য আপনি বলিয়াই একথা বলিলাম, কারণ আপনাকে ইহার প্রতিকারের সমঞ্জস সমীহা কবিতে হইবে।' সে কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি ফার্ডিনেণ্ডের বর্ত্তমান চিত্তের অবস্থা অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কারণ আমি বিলক্ষণ জানিতাম, তিনি যে কার্য্য করিবার জন্য একবাব সংকল্প করেন, তাহা নিবারণ করিতে কেহই সক্ষম নহে। সুতরাং পুত্রের কথা মাতাকে জানাইব স্থির করিলাম। ইহার দুই দিন পর ফ্রেডারিক পুনরায় আমার বাটী আসিয়া মাতার দৌর্ম্মল্য জানাইল এবং তাহার পূর্ব্ব উক্তি দৃঢ় কবিবার মানসে বলিল,—'গত রজনীতে তিনি কোন এক মূল্যবান দ্রব্য একমুষ্টি লইয়া উদ্যান অভিমুখে গমন করেন এবং তাহা কোথায় রাখিয়া ফিরিয়া আসেন।' নিশীথে একপ অভিনয় বিস্ময়কর নহে কি? আমার মনে নানারূপ সন্দেহ সমুদ্ভূত হইতেছে। তাহাব কথা শুনিয়া ফার্ডিনেণ্ডের নৈশকার্য্যাবলী অনুশীলন করিতে অত্যধিক স্পৃহা হইল। বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির কবিলাম, অদ্য রজনীতে তাঁহার ভবনের নিকট লুকাইয়া থাকিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ডের সত্যাসত্য পরীক্ষা কবিব। অতঃপর সন্ধ্যাব পব প্রাশনক্রিয়া সমাপন করিয়া ফার্ডিনেণ্ডের উদ্যানের সন্নিকট একটী মহীরুহের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিলাম। এইস্থান হইতে তাঁহার গৃহাভ্যন্তর পর্য্যন্ত সুন্দররূপে দেখা যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী,—নিশাকর হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রাত্রি দশটা হইতে সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত আমি চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। শীতে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত ও আড়ষ্ট হইতেছে, এমন সময়ে আমি আমার কর্ত্রীর অত্যাশ্চর্য্য নৈশপরিভ্রমণ দেখিতে পাইলাম।

সর্ব্বপ্রথমে আমি দেখিলাম, শ্বেতবস্ত্রবিমণ্ডিত একব্যক্তি গৃহের সম্মুখস্থ বৃক্ষের ছায়ান্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহার উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও একত্রীভূত হইয়া বক্ষোপবি সংস্থাপিত। আমার অতি নিকটে উপস্থিত হইলে, বার্দ্ধক্য ধবলায়িত চূর্ণ কুন্তল এবং গলিত মুখমণ্ডল

দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, আমার মনিবের জরাজীর্ণ দেহযষ্টিখানিই শনৈ শনৈ অগ্রসর হইতেছে। তিনি আমায় অতিক্রম করিয়া গেলে, আমি লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে তাঁহার পদানুসরণ করিলাম। তিনি প্রথম উদ্যান অতিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র ময়দানের উপর দিয়া পুনরায় একটী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটী সংকীর্ণ অন্ধকারময় পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আমিও অতি সন্তর্পণে তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলাম। আমি সেই অপ্রশস্ত পথটীর নিকট যাইয়া দেখিলাম, কর্ত্রী তথা হইতে পঞ্চবিংশতি গজ ব্যবধানে পথটীর প্রান্তঃসীমায় গতিরোধ করিয়াছেন। তথায় তিনি কি করিতেছেন, অবশ্য আমি তাহা জানিতে পারিলাম না, কিন্তু আমার বোধ হইল, তিনি সঙ্গে করিয়া যাহা আনিয়াছিলেন, তৎস্থানে তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বাটীঅভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি নিকটস্থ একটী ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিলাম। আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি শ্বাসবায়ু পর্য্যন্ত রোধ করিয়া রহিলাম। তৎপর আমি দেখিলাম, তিনি শূন্যহস্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও নিজ আলয়াভিমুখে চরণ চালিত করিলাম। কর্ত্রী পথিমধ্যে একটী ছোট খাল কেমন করিয়া যুবাপুরুষের ন্যায় অক্লেশে অতিক্রম করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যাহা হউক, রজনীতে তাঁহার গৃহ পরিত্যাগের কারণ জানিতে পারিয়া একটু আনন্দিত হইলাম। মনের আবেগে সুমধুর নিঃস্বনে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে করিতে আমি গৃহে উপনীত হইলাম।

পরদিন প্রত্যূষে যথায় ফার্ডিনেও ধন লুকাইয়া আসিয়াছিলেন, তথায় প্রতিগমন করিয়া, পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতে পাইলাম। মৃত্তিকার নিম্নে একটী কাষ্ঠ পেটিকার মধ্যে মণিমুক্তাখচিত হেমহীরা বিজড়িত একটী মুকুট। অনুমান করিলাম, যৌবনাবস্থায় কর্ত্রী ঐ মুকুটটী মাথায় দিতেন। আমি মুকুটটী লইয়া লুকাইয়া বাড়ী আনিলাম এবং ইহার শেষ ফল দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

ঐ দিবস পরাহ্নে আমি কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, প্রাসাদের সন্নিকট ময়দানের মধ্যে ফ্রেডারিককে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিবামাত্র আমার নিকট আসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। কথা

প্রসঙ্গে সে অট্টহাস্য করিয়া বলিল,—'বেশ চলিতেছে, গত রাত্রেও ঐরূপ হইয়াছে। অতি ভয়ানক কথা মহাশয়!

'তিনি ঐ সকল দ্রব্য দিয়া কি করেন বুঝিতে পারিতেছি না। গত রাত্রিতে আমার কক্ষের বাতায়ন পথ দিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু এই মাঠ পার হইয়া কোথায় যাইলেন, তাহা আর দেখা গেল না এখন কি করা যায়? অবশ্য আপনি একটী কাজ করিতে পারেন। (কানের নিকট মুখ আনিয়া) এই রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।'

'বিবেচনা করিয়া দেখিব' বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

ঘটনাস্রোত মন্দ হইতে অতি মন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কন্যাকার রহস্য আমি যে অবগত হইয়াছি, ফ্রেডারিকের কথায় বুঝা যায়, সে তাহা জানে নাই, অথবা সে এ বিষয়ে আমার উপর সন্দেহ করে নাই। অতঃপর আমি কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল না। বিদায় লইয়া যাইবার সময় ফ্রেডারিকের দাসীকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব-ধারণাই বদ্ধমূল হইল।

আমি বাটীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একটী ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্রী আমায় ডাকিতেছেন।" আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলাম। কর্ত্রীর নিকট উপনীত হইবামাত্র তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন,—

'পেলেন? আমার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, এখন পুলিসে দাও। আমার বহুমূল্য হার এবং শিরস্ত্রাণ হারাইয়াছে, আমি আদেশ করিতেছি, ত্বরায় পুলিসে সংবাদ দাও।'

'আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না। যদি অনুসন্ধানের ভার আমার উপর অর্পণ করেন, তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।'

তিনি সবেগে হস্তপ্রসারিত করিয়া বলিলেন,—

'ভাল, তুমি একবার দেখ। তোমার ন্যায়পরতা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা, সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী আমি বিদিত আছি। তোমার দ্বারা নিশ্চয়ই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে—আমার ধ্রুব বিশ্বাস। পরিপন্থিকে আমি জানি।'

এইসময়ে একজনের পদধ্বনী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, আমি কর্ত্রীকে নীরব হইতে অনুরোধ করিলাম।

তাঁহার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়া স্থির করিলাম যে, এ ঘটনা অন্য কাহারো নিকট যেন প্রকাশ করা না হয় এবং প্রত্যেক ভৃত্যের কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। পরে একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে রাত্রিতে কর্ত্রীর উপর সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। ভগবান মরীচিমালী সমস্ত দিবস অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া পশ্চিম আকাশে যাইয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন। আমি একজন পারদর্শী ডিটেক্‌টিভকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনাস্থানে উপনীত হইলাম। রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় একটী লোক তথায় আসিল। আমরা যেখানে লুকাইয়াছিলাম, তাহার নিকট হইতে সে স্থান বেশী দূর নহে, সুতরাং তাহার কার্য্য আমরা স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। সে খানিকটা মাটী ও পরিবেষ্টিত লতাগুল্মাদি অপসারিত করিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিল,—

'বাক্‌স্ ! নাই—সব গিয়াছে।'

আমি স্বর শুনিয়াই তাহাকে ফ্রেডারিক বলিয়া চিনিলাম। সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিগমন করিলে আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলাম। প্রায় মধ্যরাত্রিতে পুনরায় সেই ব্যক্তি আসিল। আমি লুক্কাইত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখে উপনীত হইলাম এবং একটী বামামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে বলিলাম,—'নমস্কার মহাশয়।'

আমি এই কথা বলিবামাত্র সে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিকটস্থ একটী বেড়া উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দৌড় মারিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম,—

'কোথা যাও, যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে দাঁড়াও।' তাহার সহিত এই রকম বচসা হইতেছে, ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক তথায় আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে বলিল,—

'সাবধান,—তাহাকে ছাড়িয়া দাও।'

এমন সময় আমার সহচর ডিটেক্‌টিভ আসিয়া তাহাকে ধৃত করিলে আমি অবগুণ্ঠিকাকে বলিলাম,—

'মুখাবরণ উন্মোচন কর।'

ফ্রেডারিক বলিল,—'বাক্লি! আর কি? এখন মুখ দেখাও।' তৎপর আমাকে বলিল,—'তুমি যদি আমার পরিচিত এবং উকীল না হইতে, তবে—'

তাহার কথা শেষ না হইতেই ডিটেক্‌টিভ বলিল,—

'চুপ্ চোর!' অতঃপর কামিনীর মুখাবরণ অনাবৃত হইলে দেখিলাম, তিনি আমাদের ফ্রেডারিকের পরিণীতা ভার্য্যা। অবশেষে তাহাদিগকে লইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া এই কথা প্রসঙ্গে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম।

ফ্রেডারিক বলিল,—'আমি মাতার বিপরীত দানপত্রের কথা শ্রবণ করিয়া, মাতার মনের স্থিরতা নাই সুতরাং দানপত্র ঠিক হয় নাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি এবং আমার স্ত্রীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি। মাতাকে ঐ স্থানে দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে দেখিয়া আমরা অদ্য তাহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলাম। পরে যাহা ঘটিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন।'

অনেক বাকবিতণ্ডার পর স্থির হইল, তাহারা উভয়েই সেইদিবস সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আর এখানে আসিবে না। আমিও তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এবিষয়ে আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলাম না। তৎপর আমি অপহৃত দ্রব্য সমূহ আমার কর্ত্রীকে প্রত্যার্পণ করিলাম, কিন্তু এ ঘটনার বিষয় তাঁহাকে কিছুই জানাইলাম না। অবশ্য তিনি তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকেই চোর স্থির করিয়াছিলেন।

পরবৎসর ফাডিনেণ্ডের মৃত্যু হয়। কিন্তু পুত্র কিম্বা পুত্রবধূ কেহই ফিরিয়া আসে নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

একটী ইংরেজি গল্প হইতে।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

দদ্রুরোগের ঔষধ।—পুরাতন ঘৃতের সহিত অল্পমাত্রায় সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া দদ্রুস্থানে ২।৩ দিন লাগাইলে দদ্রু বিনষ্ট হয়।

একতোলা পরিমাণ গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চারি তোলা কেরোসিন তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া দিবে এবং ৫।৬ দিন প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া দদ্রুস্থানে লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

সোনালু গাছের কচিপাতা লেবুর রসে বাটিয়া দিবসে ২।৩ বার দদ্রু-স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

তুলসী পত্রের রস লবণের সহিত মর্দ্দন করিয়া দদ্রুস্থানে মধ্যে মধ্যে লাগাইলে দদ্রু বিনষ্ট হয়।

সোহাগা, ধুপ, গন্ধক ও ফটকারী সমভাগে মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অল্প জল সংযোগে মধ্যে মধ্যে লাগাইলে ২।৩ দিনের মধ্যে দদ্রু নষ্ট হয়।

একতোলা গন্ধক ও অর্দ্ধতোলা হরিতাল উত্তমরূপে গুঁড়া করতঃ কলিচূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩।৪ দিন সামান্য পরিমাণে দদ্রুস্থানে লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

পাঁচড়ার ঔষধ।—প্রথমে নিমের পাতার জলদ্বারা ধৌত করিয়া নারিকেলের তেলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে উপকার হয়।

নারিকেলের তেলের সহিত সবেদা উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ অগ্নির উত্তাপে সামান্য উষ্ণ করিয়া লাগাইলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

কমলালেবুর শুষ্ক খোসা পোড়াইয়া খাটি সরিষার তেলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে উপকার হয়। সরিষার তেল ৴।৹ একপোয়া লও, পরে মেটে সিন্দুর একতোলা, নিমের শিকড় একতোলা ও রসুনের কোওয়া অর্দ্ধতোলা লইয়া রাখ। তেল ঘুঁটের আগুনে চড়াইয়া দিয়া ঈষৎ উষ্ণ হইলে তন্মধ্যে উক্ত তিনটি দ্রব্য নিক্ষেপ কর। যখন দেখিবে, মলমের মত হইয়াছে, তখন অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। এই মলম দিনে ৪।৫ বার পাঁচড়ায় লাগাইলে ৩।৪ দিনের মধ্যে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

একখণ্ড লৌহ ও একতোলা তুঁতে একটী মৃণ্ময়পাত্রে জল দিয়া ২৪

ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে পাঁচড়া উত্তমরূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া একটি খড়দ্বারা অতি সামান্য পরিমাণে পাঁচড়াতে লাগাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মোমছাল নারিকেলের তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উষ্ণ করিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে উপকার হয়।

দূষিত ক্ষতের ঔষধ।—পুরাতন ঘৃত ও মোম সমান পরিমাণে লও। উহার চতুর্গুণ বনচালিতা নামক গাছের পাতার রস সংগ্রহ করিয়া একত্রে অগ্নিতে পাক কর। পরে কিছুক্ষণ অগ্নির উত্তাপ দিতে দিতে যখন দেখিবে যে, মলমের ন্যায় হইয়াছে, তখন নামাইয়া সাবধানে রাখিয়া দেও। নিম্বপত্র জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া সেই পত্র ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া জল ঠাণ্ডা হইলে সেই জলদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ সকালে ও বৈকালে উক্ত মলম লাগাও। এইরূপে ৪।৫ দিন মলম লাগাইলেই ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী।

ছড়া।

সীতার সাধ।

মাঘে মকরে মিষ্টি কচুতলে সিম।
ফাগুনে দু'গুণ মিষ্টি বার্ত্তাকুতে নিম॥
চৈতে শ্রীফল রাম খাওয়াইলেন বনে।
বৈশাখে শশর মাংস শোল মাছে আমে॥
জ্যৈষ্ঠে পাকা আম আষাঢে কাঁটাল।
শাওন মাসে খই দই ভাদ্রে কলা তাল॥
আশ্বিন মাসে নারকেলখণ্ড কার্ত্তিকে গিরিওল।
আগুন মাসে সকচেলের অম্ল মাগুর মাছের ঝোল॥
পৌষ মাসে খই মুড়ি খেতে বড় মিঠে আর বাসি পিঠে।
শীতে, আর খেয়েছ কি ?
তপ্তভাতে বেগুণ পোড়া খেচুরিতে ঘি॥

শ্রীমতী হৈমবতী দেবী।

ব্যথার ব্যথী।

(১)
প্রকৃত ব্যথার ব্যথী
এ জগতে কেহ নাই,
সকলি যে স্বার্থপর
কেবল দেখিতে পাই।

(২)
আমার ব্যথায় কেহ
পাইয়া অশেষ ব্যথা,
ফেলে বিন্দু অশ্রুজল
কহে দু'টী মিষ্ট কথা,

(৩)
ধরামাঝে সব স্থান
দেখিলাম খুঁজে খুঁজে,
না পড়িল হেন বন্ধু
আমার নয়ন মাঝে।

(৪)
কিন্তু স্বার্থপর বন্ধু
দেখিতেছি শত শত,
নিজ স্বার্থে নিশিদিন
ঘোরে যারা অবিরত।

(৫)
সুখের সময় দেখি
বন্ধুর অভাব নেই,
শত বন্ধু জুটে এসে
ভবে চির রীতি এই।

(৬)
কত যে মায়ার ভঙ্গি
তখন দেখায় তাঁরা,
তাঁদের মায়ায় প'ড়ে
হ'য়ে যাই দিশেহারা।

(৭)
মনে ভাবি তারা বুঝি
আমার ব্যথার ব্যথী,
চিরদিনই থাকিবেক
আমার সঙ্গের সাথী।

(৮)
কিন্তু, যবে সুখ-দিন
ক্রমে ক্রমে হয় ক্ষীন,
তখন সে বন্ধুদের
নাহি থাকে কোন চিন।

(৯)
বুঝে'ছি সুখের ভাগী
তাহারা কেবল হয়,
দুঃখের সময়ে হায়!
তারা আর কিছু নয়!!

(১০)
কেবল করুণাময়
জগতের পতি যিনি,
প্রকৃত ব্যথায় ব্যথী
সকল সময়ে তিনি।

শ্রীমহম্মদ মোজাম্মেল হক্।

আনিলে কেন?

কেন এলাম ভবের মাঝে,
মূর্খই হব যদি।
আমায়, আন্‌লে কেন, লোকসমাজে,
লজ্জা দিতে বিধি॥

বিদ্বানেরই, চাকুরী পাওয়া,
কঠিন কত ভাই।
আমি, তাতেও শূন্য, দশাছিন্ন,
মুরব্বির জোর নাই॥

উকীলদলের কোলাহলে,
সহর পু'রে গেল।
ওরে, মোক্তারিতে আঁট্‌বে কেন,
পশাবটি তাই বল?

এম-এ বি-এ পড়েছে তল,
ফল দেখি না তাতে।
তাদের, মাষ্টারীতে কুড়ি টাকা,
অদৃষ্টের জোরেতে॥

প্রবেশিকায় প্রবেশ শেষে,
লাভ দেখি না ভাই।
দেখি, এপ্রেণ্টিসে লোকসান্ শুধু,
তাতেও রেস্ত চাই॥

মাইনার ও মধ্য-বাঙ্গলা,
মাস্‌তুতো ভাই এরা।
তাদের, নাইকো অন্ন, কাজেই ক্ষুণ্ণ,
জীয়ন্তে রয় মরা॥

পাঠশালার এক গুরুগিরি,
(সকলের জোটে না)।
খেটে, বহুবখানেক একটি খোকে,
পায় পনর আনা॥

তশীলদারী কি ঝকমারী,
তবু তার আদর।
কিন্তু, ঘরের কোণে, গড়ুর পাখী,
বনিতার বাঁদর॥

চাকুরী ক'রে এলেম ঘরে,
ধারে চ'লে যায়।
আবার, চাকুরি গেলে বাতাস খেয়ে,
প্রাণ বাঁচান দায়॥

কিনিলে, তিসি তুষি লবণ সরিষা,
ইয়ার বেজার বেজায়।
এই ভাবনায় সে কাজে আর,
মন যেয়েও না যায়॥

দেখি, সহর মাঝে মুজুর খেটে,
বহুত রোজগার হয়।
একমনে কয় উহাই করি,
আর মনে কয় নয়॥

থাক্‌তো যদি পুঁজিপাটা,
ভগ্নীপতি তেমন।
আমার, মিলে কিনা মিলে চাকরি,
দেখে নিতাম কেমন॥

পেতাম খাতির, হ'ত জাহির,
নাম্‌টি বিদেশ বেড়ে।
করিতাম, পাকাবাড়ী জুড়ী গাড়ী,
দূর করিতাম কুঁড়ে॥

হ'তাম, সদর নায়েব, কদর বুঝে,
সেলাম দিত সবে।
চল্‌তাম, ফ্যাসান মাফিক নজর কড়া,
কিন্তু কিসে হবে?

তাই বলি, কেন এলাম ভবের মাঝে,
মূর্খই হব যদি।
আমায়, আনিলে কেন লোকসমাজে,
লজ্জা দিতে বিধি?

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

কেমনে ভুলিব ! *

(১)

কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
ফুল্ল শতদল সম,
অতুলন নিরুপম,
সেই চাঁদ মুখখানি কেমনে ভুলিব ?
কুসুম সুষমারাশি,
অথবা চাঁদের হাসি,
ছিল যাহা প্রাণাধিক ! আর কি তা দেখিব,
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?

(২)

কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
সেই হাসি, সেই খেলা,
আধ আধ কথা বলা,
"বা-বা" এই আধস্বর আর কিরে শুনিব,
পারিজাত সমতুল,
তুই রে স্বর্গীয় ফুল,
গোলাপ মল্লিকা এর কার সনে তুলিব,
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?

(৩)

কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
হাঁটি হাঁটি পা যাওয়া,
গলা ধ'রে চাঁদ চাওয়া,
হায় রে সে কথা মণি কেমনে ভুলিব ?

---

* ঢাকা শ্রীনগরের অন্তর্গত কয়কীর্ত্তন নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র শিশুপুত্র 'শীতলচন্দ্র' পিতামাতার অঙ্কশূন্য করিয়া চলিয়া যায়। শোকসন্তপ্ত বন্ধুবর এ সম্বন্ধে আলোচনায় একটী কবিতা লিখিতে অনুরোধ করেন, তাঁহারই অনুরোধে ইহা লিখিত হইল, তিনিও একজন আলোচনার গ্রাহক।

এটী কি—ওটী কি বাবা,
কে আর শুধাবে বাবা,
এটী ইহা, ওটী উহা আর কারে বলিব ?
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
(৪)
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
হাসি মুখে ধেয়ে ধেয়ে,
এলে পরে হামা দিয়ে,
তেমনি করি 'মণি' ব'লে কারে বুকে ধরিব ?
প্রভাত-তরুণ রবি,
নয়ন-রঞ্জন ছবি,
অসময়ে অস্ত যাবে কেমনে (তা) বুঝিব।
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব।
(৫)
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
না ফুটিতে গন্ধরাজ,
পারিজাত পুষ্পরাজ,
হবে হায়! বৃন্তচ্যুত কেমনে বুঝিব ?
হাসিমুখে চুমা দেওয়া,
'হাম' বলে হাম খাওয়া,
এ পোড়া জীবনে মণি! আর কি দেখিব,
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
(৬)
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
তুষের অনল মত,
দহে হৃদি অবিরত,
ভুক্তভোগী জানে জ্বালা ব'লে কি জানাব ?
তোর স্মৃতি হৃদে ধরি,
এখন যদি রে মরি,
চাঁদমুখ মনে হ'লে সুখে নাহি মরিব,
কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?

(৭)

কেমনে ভুলিব যাদু কেমনে ভুলিব ?
পেয়ে সেথা পিতামাতা,
ভুলেছ মোদের কথা,
এ জীবনে আমরা রে ভুলিতে নারিব ?
আয় রে হৃদয়ে ধরি,
শীতল ! শীতল করি,
নিদারুণ এ যাতনা কতদিন সহিব,
স্মরি চাঁদমুখ নিত্য আঁখিনীরে ভাসিব ?

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।—আলোচনার উপহার প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল, প্রণীত "লীলা" ও সম্পাদকদ্বয় প্রণীত "অদ্ভুত ডাকাত" ও "আজগুবী গল্প" এবং সন্ন্যাসী জীবন, এই চারিখানি উপহার পুস্তক প্রায় ৫০০ শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। মাসিক পত্রিকায় এরূপ উপাদেয় উপহার কেহ কখন দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র ১৷৽ টাকা পাঠাইলে, আমরা এই মাস মাত্র উপহার দিতে পারিব। গ্রাহকগণ শীঘ্র টাকা পাঠান, বিলম্বে নৈরাশ হইতে হইবে।

কৈফিয়ৎ।—কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ডিমলার রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ সেন বাহাদুরের সচিত্র জীবনী আলোচনায় প্রকাশ করিব বলিয়া লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা অদ্যাবধি তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই; দোষ আমাদের নহে। রাজা অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু ফটো ও জীবনী লিখিবার আবশ্যকীয় বিষয় ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াও পাওয়া যাইতেছে না, তজ্জন্য এত বিলম্ব। এবার আমরা রাজা বাহাদুরের নিকট শেষ পত্র লিখিয়াছি, ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করিব।

ইউনিক থিয়েটার।—আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া, ভূতপূর্ব্ব রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে উক্ত থিয়েটার কোম্পানীর দ্বারা, "রত্নমালা ও কপালকুণ্ডলার" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। তত্ত্বাবধারক বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার অমায়িকতায় আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।

লিখিবার কালী।—বাজারে আজকাল অনেকেই নানাপ্রকার কালী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। আমরা পুরাতন চিনাবাজারের প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা মেসার্স অঘোরচন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্সের প্রস্তুত এক বোতল ব্লু ব্ল্যাক কালী উপহার পাইয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কলম শীঘ্র খারাপ হয় না। কালীও বেশ গাঢ়, উক্ত কোম্পানীই ইহার একমাত্র এজেণ্ট। আমরা সকলকে ইহাদের প্রস্তুত কালী ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

ধাতুপীড়ার ঔষধ।—ঘোড়ামারার প্রসিদ্ধ শ্রীনবকৃষ্ণ কবিরাজ বিশেষ পরিচিত; শুধু স্বদেশে নহে, বিদেশেও কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা বিষয়ে সুযশ আছে। আমরা তাঁহার এক কৌটা "কামেশ্বর বটিকা" উপহার পাইয়াছি। ইহা আধুনিক পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় সিদ্ধির বড়ি নহে, ধাতুদৌর্ব্বল্যের ইহা মহা উপকারী ঔষধ। পরীক্ষা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

লাহিড়ী কোম্পানী।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তকের আদি বিক্রেতা লাহিড়ী কোম্পানীর নাম দেশপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের ঔষধালয় ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হইয়া আজকাল কলিকাতার চারিদিকেই ইঁহাদের শাখা ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইঁহাদের ঔষধ সকল টাট্‌কা অথচ মূল্য বেশী নহে। শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ। কলেজ ষ্ট্রীটের প্রধান ঔষধালয়ে আমরা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি।

পুটিয়া রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

রাজসাহী জেলার পুটিয়া একটি পুরাতন রাজধানী। এই রাজবংশ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। "বার ভুঁইয়ার" রাজাদিগের মধ্যেও পুটিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই রাজসংসার হইতে নাটোর এবং নাটোর ষ্টেট হইতে দিঘাপতিয়া রাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে; সুতরাং এরূপ একটি প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় পাইতে কাহার না কৌতূহল হয়? বিশেষতঃ ইঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপও অন্যান্য রাজাদিগের তুলনায় নিতান্ত অল্প নহে। যে বংশে রাণী ভুবনময়ীর কৃত বৃন্দাবনধামে ও কাশীধামে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির প্রভৃতিতে তাঁহার ভুবনময় অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, যে বংশে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অমানুষিক প্রতিভা ও অনুপম দানশক্তির বিষয় অদ্যাপিও দেশ-বিদেশে কীর্ত্তিত হইতেছে, যে বংশে স্বনামধন্যা পুণ্যময়ী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী মহাশয়া প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে রাজসাহী কলেজ বোর্ডিং প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত অসহায় গরীব ছাত্রবর্গের সমূহ উপকার করিয়াছেন, এবং যিনি সাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থ গভর্ণমেণ্টকে এককালে সাত আট হাজার টাকা দান করিয়া পিপাসাতুর প্রজাপুঞ্জের পিপাসা শান্তির উপায় বিধান করতঃ জগতে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, এইরূপ একটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশের পরিচয় জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইবে সন্দেহ নাই।

সাধু বাগচী এই রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিরাবণ পটির গাঁইকস্তা কুলীন, তাঁহার সপ্তদশ পুরুষ পর মহাত্মা বৎসাচার্য্য আবির্ভূত হন।

বৎসাচার্য্যের সময়েই আলাইপুরের লস্করী খাঁর নিকট হইতে তিনি জমিদারী প্রাপ্ত হন, লস্করী খাঁর নামানুসারে এই পরগণার নাম লস্করপুর পরগণা হইয়াছে। বৎসাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ, ইনি দশভূজার সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু আয়াসলব্ধ সাধনার স্বর্ণ পঞ্চমুণ্ডি আসন অদ্যাপিও সাঁজার বাটীর মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম পুষ্পরাক্ষ।

[illegible] বাদসাহ দরবারে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত [illegible]চন্দ্র [illegible] মজুমদারের পুত্র পিতাম্বর। পিতাম্বর রাজত্ব পাইলে ইনিও বাদশাহ দরবারে “সহর মণ্ডল” উপাধি লাভ করেন। ঠিক এই সময়েই তাহিরপুরের রাজা ইন্দ্রবাহু “জমাদার” উপাধি পাইয়াছিলেন। পিতাম্বর সহর মণ্ডলের পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর।

রামচন্দ্র ঠাকুর সাঁতইলে বিবাহ করিয়া পাঁচুড়িয়া হন। জনশ্রুতি আছে, এই বিবাহ নিতান্ত চক্রান্তমূলক, বাস্তবিক পক্ষে এই উদ্বাহবন্ধন তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায় হইয়াছিল। রামচন্দ্র ঠাকুরের চারিপুত্র, ১ম ভগবতীদাস ঠাকুর, ২য় জীতিন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, ৩য় বীরেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর এবং ৪র্থ রতিকান্ত ঠাকুর।

রতিকান্ত ঠাকুরের পুত্র নরনারায়ণ ঠাকুর। ইঁহার অপর তিন ভ্রাতার বংশাবলী যথাক্রমে মধুখালি, শিরইল এবং চৌপুখরিয়ায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রতিকান্ত ঠাকুরের বংশ পুটিয়াতে সেই সময় হইতেই রাজত্ব করিয়া আসিতেছে।

নরনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র প্রেমনারায়ণ ঠাকুর। প্রেমনারায়ণ ঠাকুর বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনিই গোপাল বিগ্রহ ও গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, গোপালের সুরম্য মন্দিরের শিরোভাগে লিখিত আছে যথা,—

> যুগ যুগ কলাসংখ্যশকে রক্ষার্থ হরিমন্দিরং,
> মৎকৃতং তৎ প্রকুর্বন্তি প্রেমনারায়ণ সুধীঃ॥

এই প্রেমনারায়ণ ঠাকুরের সময়েই শ্যামসাগর নামক বৃহৎ জলাশয় খনন হয়, তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তি এইরূপ;—কুম্ভকারজাতীয় শ্যামনামক ব্যক্তির দ্বারা প্রথম জল উদ্ধার হয় বলিয়া, এই জলাশয়ের নাম শ্যামসাগর হইয়াছে. কিন্তু এই কিংবদন্তির সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ হয়; কেন না, ইনি যেরূপ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া শ্যামসাগর নাম দান করাই সঙ্গত। ইঁহার একমাত্র পুত্র, পুত্রের নাম অনুপনারায়ণ ঠাকুর।

অনুপনারায়ণ ঠাকুরও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব এবং সৌভাগ্যবান পুরুষ। জনৈক অভ্যাগতের নিকট ইনি ৺গোবিন্দ জীউ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অদ্যাপিও এই গোবিন্দ জীউর যথারীতি পালাক্রমে ভোগপূজাদি সুচারুরূপে

নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এই গোবিন্দ জীউর কল্যাণে প্রত্যহ বহুতর ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখীগণ প্রসাদ পাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। গোবিন্দ জীউর দেবত্ব সম্বন্ধে যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য কথা প্রচলিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলে গোবিন্দ জীউ যে পুটিয়াতে জাগ্রত রহিয়াছেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ থাকে না। অনুপনারায়ণ ঠাকুরের চার পুত্র, ১ম নরেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, ২য় সুদনারায়ণ ঠাকুর, ৩য় রূপেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ও ৪র্থ প্রাণ-নারায়ণ ঠাকুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৫১ সালে জমীদারী বাটওয়ারা হয়। প্রথমতঃ চারি ভ্রাতায় প্রত্যেকে সিকি অংশ করিয়া লইলেন, তৎপর ছোট তিন ভ্রাতা স্ব ইচ্ছায় প্রত্যেকে ৵১০ অর্দ্ধ আনা অংশ জ্যেষ্ঠকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

তাহাতে বড় তরফ ।৵১০ সাড়ে পাঁচ আনা ও অপর তিন ভ্রাতার প্রত্যেকে ৶১০ সাড়ে তিন আনার মালেক হইলেন, রূপেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার অংশ সুদনারায়ণ ঠাকুরের পুত্রগণ পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ সুদনারায়ণ ঠাকুরের পুত্রদিগের ।৶০ সাত আনা অংশ পাওনা হইয়াছিল। এই ।৶০ সাত আনার ৪র্থ পুত্র ।১৩।— চারি আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির মালেক ও পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর ৵৩।— এক আনা তের কড়া এক ক্রান্তির মালেক, এইরূপ খণ্ড খণ্ড অংশ হইয়াছে। নরেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর অর্থাৎ বড় তরফের ।৵১০ সাড়ে পাঁচ আনা অংশ ও অন্য ভ্রাতা প্রাণনারায়ণ ঠাকুরের ৶১০ সাড়ে তিন আনা অংশই স্থির ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ পুত্র, ১ম ভুবনেন্দ্র নারায়ণ, ২য় রুদ্রনারায়ণ, ৩য় সুরেন্দ্রনারায়ণ, ৪র্থ শিবেন্দ্রনারায়ণ ও ৫ম বসুনারায়ণ ঠাকুর।

ভুবনেন্দ্র নারায়ণের পুত্র জগন্নারায়ণ ও জগন্নারায়ণের পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণ। এই হরেন্দ্র নারায়ণের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়, পুত্রের নাম যোগীন্দ্রনারায়ণ এবং কন্যা কাশীশ্বরী দেব্যা।

যোগীন্দ্রনারায়ণ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইহার সময়ে নীলবিদ্রোহ হয়। মিঃ রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানিকে হানই স্থানে স্থানে বাধা দিয়া প্রজাগণকে অনেক পরিমাণে নিরাপদ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী দয়াদাক্ষিণ্যে ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানে পুটিয়া উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বারান্তরে ইহার অক্ষয়কীর্ত্তিগুলি বিশদভাবে "আলোচনায়"

আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। যোগীন্দ্রনারায়ণের পুত্র, যতীন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।

যতীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ন্যূনাধিক দুই বৎসর মাত্র। ইনি ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঢুল্লা গ্রামে ৺ভুবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। যতীন্দ্রনারায়ণের পাটরাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী মহাশয়াই বড় তরফের বর্ত্তমান অধীশ্বরী, ইঁহার সুকীর্ত্তি কাহিনী ক্রমশঃ সুচারুরূপে প্রকাশ করিবার একান্ত বাসনা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

সোহাগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পীড়িত পুত্র।

একাধারে সকল সুখ কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। জগতে এমন কোন লোক নাই, যিনি বলিতে পারেন,—"আমি সকল বিষয়ে সুখী—আমার কোনরূপ অভাব নাই।" সামান্য দরিদ্র হইতে রাজাধীরাজ মহারাজ পর্য্যন্ত একটা না একটা দুঃখ হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। ইহাই জগতের নিয়ম—বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না বলিয়াই বুঝি অতুলধনে অধীশ্বর—স্বনামধন্য জমীদার হরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকল সুখে সুখী হইয়াও আজ কয়েক মাস হইতে এক দুর্বিষহ চিন্তানলে জর্জ্জরীভূত হইতেছেন। আহারে বিহারে, শয়নে উপবেশনে, কিছুতেই তাঁহার সুখ নাই। অন্তঃপুরে হরসুন্দর বাবুর স্ত্রী লীলাবতী ও অপরাপর পরিজনবর্গও সকলে যারপরনাই ম্রিয়মান।

বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত। হরসুন্দর বাবু এখনও স্নানাহার করেন নাই; যেন কাহার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু! কবিরাজ মহাশয় আসিতেছেন।" বৃদ্ধ হরসুন্দর এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলেন, চাকরের কথায় তাঁহার চমক

ভাঙ্গিল; তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অশ্বযানের তত প্রচলন ছিল না। বড়লোকেরা প্রায়ই পাল্কী ব্যবহার করিতেন। দেখিতে দেখিতে একখানি পাল্কী আসিয়া জমীদার হরসুন্দর বাবুর বাটীর দ্বারে আসিয়া লাগিল। বৃদ্ধ বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন; কবিরাজ মহাশয় পাল্কী হইতে অবতরণ করিবা-মাত্রই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল; কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরসুন্দর বাবু! আজিকার সংবাদ কি কল্য অপেক্ষাও মন্দ?" হরসুন্দর বাবু ছলছল নেত্রে বলিলেন, "তাদৃশ মন্দ নহে; তবে রোগী ক্রমশঃ যেরূপ দুর্ব্বল হইতেছে, তাহাতে তাহার প্রাণের আশা অল্প।" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হরসুন্দর বাবু! রোগভোগ করিয়া মানুষ কবে সবল হইয়া থাকে? যে রোগী ছয় মাস ধরিয়া রোগশয্যায় শায়িত, সে দুর্ব্বল হইবে না ত কি? আপনি অত উতলা হইবেন না। হাড় থাকিলে মাস হইতে কতক্ষণ লাগে?"

হরসুন্দর বাবু বলিলেন, "মহাশয়! বহু যাগযজ্ঞ করিয়া ঐ পুত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছি; এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রটী আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর—আমাদের ভাগ্যে যে সে এ যাত্রা রক্ষা পাইবে, তাহা ত বিশ্বাসই হয় না—তবে ভগবানের কৃপা ও আপনার হাত যশ।"

কবিরাজ মহাশয় বৃদ্ধকে বড়ই কাতর দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়! কোন চিন্তা নাই; আপনার মত ন্যায়পরায়ণ জমীদারের এরূপ দুরদৃষ্ট কখনই সজ্ঘটিত হইতে পারে না, কোনও দুশ্চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিবেন না, রোগী শীঘ্রই আরোগ্য হইবে, তবে এই মাসের ক'টা দিন গত হইলে উহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র পাঠাইতে হইবে, রুদ্রপুরে এখন কিছুদিন আর থাকা হইবে না।"

হরসুন্দর বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আপনি পুটীকে একটু সুস্থ করিয়া দিন, আমি আগামী মাসেই তাহাকে লইয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতল প্রকোষ্ঠে অভাগিনী লীলাবতী একমাত্র রুগ্নপুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া—তাহার সেই শুষ্ক মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া, কতই নেত্রজল মার্জ্জনা করিতেছেন। কতক্ষণে তাহার প্রাণের পুত্র চক্ষুরুন্মীলন করিবে—কতক্ষণে একবার মা বলিয়া ডাকিবে—এই আশাতে অভাগিনী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া

শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা, নিজের দেহ পতন হউক—প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করুক—তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই; প্রাণের পুত্র আরোগ্য হউক; সন্তান নিরাময় হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুক; সন্তানবৎসলা জননী কেবল অহরহ এই চিন্তা করিয়া থাকেন—পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষিণী জননীর কেবল এই মাত্র চিন্তা, জগতে তাঁহার আর কোন আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা নাই। হতভাগ্য বঙ্গকুলাঙ্গার আমরা—এরূপ বাৎসল্যপ্রতিমা স্নেহময়ী জননীকেও দুর্বিষহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া পাপের পথ প্রশস্ত করি।

পিতা মাতাই জগতের সার—জগতে আপনার বলিবার যদি কিছু থাকে—যদি কাহাকেও আপনার বলিয়া ধরিতে হয়—তবে সে স্নেহের আধারস্বরূপ জনক-জননী। এরূপ আপনার—সন্তানের এমন পূজনীয় গুরু আর কেহ নাই। যদি অবহেলায় ভবের এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা কর, যদি ঘোর জ্বালাময় এই ভীষণ সংসারে শান্তিসুখ অনুভব করিবার আশা থাকে—তাহা হইলে জীব! কায়মনে পিতা মাতার চরণসেবা কর, তাঁহাদের পাদোদক নিত্য নিয়মিত পান কর—তাহা হইলে শরীর ও মন পবিত্র হইবে। তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সকল দেবতাকে পরিতোষ করা হইবে। সন্তানের পক্ষে পিতা মাতার তুল্য শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কে আছে? পুত্রের মঙ্গল-কামনায় নিজের দেহ পতন করিতে পিতা মাতা ভিন্ন জগতে আর কেহ পারে না। আজ অষ্টাহ হইল, লীলাবতী, অনঙ্গমোহনের পীড়া বৰ্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আহা! বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, তাহার এরূপ কঠিন পীড়ায় কোন্ জনক-জননী উদরে অন্ন দিতে পারেন? হরসুন্দর বাবু ও তাঁহার পত্নী ভাবিয়া ভাবিয়া কঙ্কালাবশেষ হইয়া গিয়াছেন। অনঙ্গমোহন ক্ষণেকের জন্য একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল; লীলাবতী অমনি শশব্যস্তে বলিলেন, "বাবা অনঙ্গ! কিছু খাবে কি?"

রোগশয্যায় শায়িত অনঙ্গ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মা! একটু জল দাও।"

লীলাবতী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন—আস্তে আস্তে পুত্রের বদনে জলের পরিবর্ত্তে একটু দুগ্ধ প্রদান করিয়া দিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে অনঙ্গের মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। এমন সময় হরসুন্দর বাবু ও কবিরাজ মহাশয় গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, লীলাবতী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। হরসুন্দর বাবু পুত্রের শিরোদেশে ও কবিরাজ মহাশয়

পার্শ্বে বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হরসুন্দর বাবু! আপনি এত ভীত হইতেছেন কেন? আজ ত রোগী অপর দিন অপেক্ষা খুব ভাল আছে; আজ নাড়ীর গতি অতি চমৎকার। কল্য যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই বিশেষ ফল হইয়াছে।" পরে রোগীকে তাহার যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোগী ধীরে ধীরে বলিল, "এক্ষণে আর অপর যন্ত্রণা তাদৃশ কিছুই বুঝিতে পারি না—কল্য রজনী হইতে যেন অনেকটা সুস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে; তবে মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক—মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা! কোন চিন্তা নাই; অদ্য একটী তৈলের ব্যবস্থা করিতেছি, তাহাতেই মাথার যন্ত্রণা তিরোহিত হইবে।" এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় সকলকে আশ্বাস প্রদান করতঃ প্রস্থান করিলেন।

অনঙ্গের পীড়ার কথঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে শুনিয়া, এবং পুত্র অপরাপর দিবস অপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে দেখিয়া, বৃদ্ধ হরসুন্দর বাবু ও লীলাবতী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং বলিলেন, "মা দুর্গে! অভাগিনীর ধন অনঙ্গকে আমার আরোগ্য কর মা! আমি আজীবন তোমার সেবা করিব।" এত বেলা হইয়াছে—পিতামাতার এখনও আহার হয় নাই বুঝিতে পারিয়া অনঙ্গমোহন বলিল, "মা! বেলা যে অনেক হয়েছে; তোমরা এখনও বসিয়া কেন?"

লীলাবতী বলিলেন, "বাবা! আবার যে আহার করিতে হইবে, তা ভাবি নাই—তবে মা দুর্গা আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন—প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতায়—আজ তুমিও একটু সুস্থ হইয়াছ দেখিয়া—আমরা সকল যাতনা ভুলিয়াছি। বাবা! এ আট দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে—তাহা ভগবানই জানেন।"

অনঙ্গ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "মা! আর বিলম্ব করো না—যাও—আহারাদির উদ্‌যোগ করগে।"

লীলাবতী বলিলেন, "হাঁ বাবা! কর্ত্তা তোমার কাছে থাকুন—আমি নীচে যাই।" এই বলিয়া লীলা রন্ধনশালায় আসিয়া রন্ধনাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্যামার মা তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় অপবাহ্ণ সময়ে রামদাস, কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তাবাবুর হাতে ঔষধ প্রদান করিয়া বলিল, "কবিরাজ মহাশয় এই বড়িটী এখনই খাওয়াইয়া দিতে বলিয়াছেন, তাহা হইলে রাত্রে আর জ্বর আসিবে না এবং এই তৈল কাল সকালে মাথায় মালিস করিতে বলিয়াছেন।" বৃদ্ধ হরসুন্দর চাকর রামদাসের প্রমুখাৎ ঔষধের অনুপান প্রভৃতি বুঝিয়া লইয়া—তাহাকে এক কলিকা তামাকু সাজিবার জন্ত বলিলেন। রামদাস প্রভুর আদেশ পাইয়া অচিরে তামাকু সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ হরসুন্দর বাবু তাম্রকুট সেবনান্তে পুত্রকে ঔষধ প্রদান করতঃ বেদানা, কিস্‌মিস্‌ও কিছু কিছু খাইতে দিলেন।

এমন সময় শ্যামার মা আসিয়া বলিল, "বাবা! তুমি চাট্টি খেয়ে এস, আমি দাদাবাবুর কাছে থাকি।" অনঙ্গও বলিল, "হাঁ বাবা! সন্ধ্যে হয়—আর দেরি করিবেন না; আপনি আসুন।" পিতা চলিয়া যাইলে অনঙ্গ শ্যামার মাকে একটু বাতাস করিতে বলিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জমীদার হরসুন্দর বাবুর কিছুরই অভাব বা দুঃখ নাই—কেবল এক দুঃখে—এক দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ অষ্টাহ হইল—এক বেলার বেশী উদরে অন্ন যাইতেছে না। এই জন্যই বলিতে হয়, একাধারে সকল সুখ মানবভাগ্যে অসম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয় বিকার।

অনঙ্গমোহন কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পিতামাতার আনন্দের আর সীমা পরিসীমা নাই। সন্তানবৎসলা লীলাবতীর ম্লানমুখকমল এতদিনের পর আবার ফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে, লীলাবতীর মুখখানি দেখিয়া দাস-দাসী সকলেই আনন্দিত; বৃদ্ধ হরসুন্দর বাবু পুত্রের আরোগ্যলাভে পুনরায় সোৎসাহে কাজ কর্ম্মে মন দিয়াছেন। নিজে ভাল হইলে—তাহার মঙ্গলের জন্য সকলেই প্রার্থনা করে। কলিকালে ভাল লোকের ভাল হইবে বলিয়া

কেহ যত্ন করে না বটে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ ভাবই প্রচলিত ছিল। হরসুন্দর বাবু ভ্রমেও কখন কাহারও মন্দ চিন্তা করেন নাই, কখন কাহাকেও কষ্ট দেন নাই, জমীদারীসংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া কখন কাহার উপর উৎপীড়ন করেন নাই, তবে তাঁহার দুঃখে কে না দুঃখ প্রকাশ করিবে? কে না ভগবানের নিকট কায়মনে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে? তুমি জগতের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, জগতের নিকট হইতে তোমার সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করা উচিত।

অনঙ্গমোহন এখন কিছু কিছু আরোগ্য হইয়াছেন—পথ্য পাইয়াছেন, ধীরে ধীরে এ-ঘর সে ঘর করিয়া বেড়াইতে পারেন। পাঠক। হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অনঙ্গের পীড়ার কারণ কি? এ পীড়ার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল দুর্ব্বিষহ চিন্তাই ইহার প্রধান কারণ—অতিরিক্ত চিন্তায় সকল প্রকার রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে—ইহা চিকিৎসকগণেরই মত। অনঙ্গমোহন অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন; এই সামান্য বয়সে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। শিক্ষাগুণে চরিত্রও মার্জ্জিত হইয়াছে।

রুদ্রপুরে তাঁহাদের বাটীর নিকট ভবদেব মুখোপাধ্যায় নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার সহিত এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল। ভবদেব মুখোপাধ্যায় কোন সরকারী অপিসে চাকুরী করিয়া বেশ দশ টাকার সঙ্গতি করিয়াছিলেন, সংসারে তাঁহার একমাত্র কন্যা মনোরমা আর সহধর্ম্মিণী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। অনঙ্গমোহন বাল্যকাল হইতে মনোরমাকে ভালবাসিত, মনোরমা যখন পাঠাভ্যাস করিত—অনঙ্গমোহন তাঁহার নিকটে বসিয়া পড়া বলিয়া দিত। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী উমাসুন্দরী অনঙ্গমোহনকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, কন্যার সহিত তাঁহাকে একত্রে খাবার দিতেন। ভবদেবও অনঙ্গমোহনের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার পিতার নিকট নিজ কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই জন্য সকলেই জানিত, অনঙ্গের সহিত মনোরমার বিবাহ হইবে। অনঙ্গ ও মনোরমা তখন ছেলেমানুষ, তাহারা কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিত না, তবে বাল্যকালে যেরূপ ভালবাসা স্বভাবত জন্মিয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সেই ভালবাসা এরূপ প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, একজন অন্যকে তিলেকের জন্য না দেখিলে থাকিতে পারিত না, যারপরনাই কষ্ট অনুভব করিত।

এই সময় মনোরমার পিতার ভয়ানক পীড়া হয়—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মনোরমার মাতুল ভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইলেন; দুই তিন মাস অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও ভবতারণ বাবু হতাশ হইলেন, চিকিৎসকগণও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন,—আর আশা নাই। অদ্য রজনীযোগেই রোগীর জীবলীলার অবসান হইবে। ফলে তাহাই হইল—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভবদেব ভবের লীলা-খেলা সাঙ্গ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। দুরন্ত কাল এই ক্ষুদ্র পরিবারের বক্ষে শোকবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া,—তাহার একমাত্র আশার ধন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতদিন সুখে কালাতিপাত করিতেছিল, কাল কাহার কথা শুনিল না, কোনও বাধ্যই মানিল না—সেই আশ্রয়দাতাকে চিরকালের জন্য লোকান্তরিত করিল। হায়! আজ উমাসুন্দরী ও মনোরমার কপাল ভাঙ্গিল—তাহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। উমাসুন্দরী পতি-শোকে ও মনোরমা পিতৃবিয়োগে একান্ত অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে—কালের কঠিন হিয়া কি এই সামান্য ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইতে পারে—ইহা যে নিতান্ত নির্ম্মম।

ভবতারণ বাবু যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্রাদ্ধের যৎসামান্য আয়োজন করিলেন। শ্রাদ্ধে তিনি বেশী খরচ পত্র করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন, এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মনোরমার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইল। তিনি অশৌচান্তে ভগ্নী ও মনোরমাকে লইয়া চিরকালের মত রুদ্রপুর পরিত্যাগ করিলেন। এখন হইতেই অনঙ্গমোহনের পীড়ার সূত্রপাত হইল, যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহার অদর্শনে যে কত যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। ভালবাসার অদর্শন যে অসহনীয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে। অনঙ্গ-মোহন মনোরমার জন্য দিবারাত্র চিন্তা করিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন—পাঠক পূর্ব্বপরিচ্ছেদে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি একটু সুস্থ হইয়াছেন; পিতার অজস্র অর্থব্যয়ে জননীর প্রাণপণ যত্নে অনঙ্গমোহন ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন! কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতার জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। হরিহর বাবুও তাহাতে সম্মত হইয়া তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ভবদেব বাবুর মৃত্যুর পর অনঙ্গের সহিত মনোরমার বিবাহ প্রস্তাব

এক প্রকার স্থগিত হইয়া গেল। মনোরমা যখন রুদ্রপুরে ছিল, সেই সময় তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আর একজন পাগল হইয়াছিল। সে গ্রামের একজন বদ্‌মাইস, নাম প্রতাপ নারায়ণ; তাহার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল বলিয়া, গ্রামের লোক তাহাকে কিছু বলিত না, বিশেষতঃ তাহার মান অপমানের ভয় ছিল না, গ্রামের লোক কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না। তাহার প্রতাপে সকলেই প্রমাদ গণিত; এইজন্য কেহই তাঁহার কথায় থাকিত না। এ হেন প্রতাপ নারায়ণ মনোরমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। মনোরমাকে হস্তগত করিবার জন্য কত চেষ্টা, কত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল দেখিয়া, সে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং যাহাতে সে মনোরমার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাকে হস্তগত করিতে পারে, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ।]

মূলে ভুল।

রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে পহুছিয়া দেখি, গাড়ী উপস্থিত। কলিকাতায় না আসিলে নয়, হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; ভৃত্য একখানা টিকিট করিয়া আনিয়া দিল—সেখানা পকেটে ফেলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে গাড়ী দক্ষিণাভিমুখে ছুটিয়া চলিল,—আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

গাড়ীখানিতে আরোহীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প,—মোটে পাঁচ ছয় জন,—তাও আবার পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া গেল। তখন আমি একা,—উন্মুক্ত বাতায়ন পথ গলাইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, উপরে অনন্ত নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ; আকাশে মেঘ নাই—হু হু শব্দে বাতাস সেই সুদীর্ঘ প্রান্তর বহিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার প্রবাসগামী হৃদয়খানি সেই নৈশ প্রশান্তির মধ্যে একা যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিল, আর কত কথা মনে জাগাইয়া আকুল করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিল;—ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল। কতক্ষণ তদবস্থায় অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠিক ঠাওর নাই—নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখি, কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

আমি গাড়ীর দক্ষিণদিকের একেবারে শেষের বেঞ্চে ছিলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি, উত্তরের শেষ বেঞ্চে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একখানা লোহিত রঙ্গের রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কিন্তু সেই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে যেন গোলাপীরঙ্গের সৌন্দর্য্যচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ঘোমটার ভিতর হইতে কেবল ফুটানা নয়ন দুইটি দেখা যাইতেছিল,—চক্ষু দুইটি আমারই মুখের উপরে সংস্থাপিত! হরি! হরি! এ বালাই কি সঙ্গের সাথী!

অনেকক্ষণ সেই নয়ন দুইটি আর অন্য দিকে ফিরিল না। সেই যে ভাস্বর কটাক্ষ,—সেই যে পদ্মপলাশ চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি, সে আমারই মুখের উপরে পড়িয়া থাকিল। হা ভগবান!—"পোড়া আঁখিতে মজালে আমায়!"

লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতে হইতেছে, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। আমি স্খলিত বসনাদি যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া দিব্যি বাবুগিরির ধাঁজে টানিতে লাগিলাম। বলিতে কি,—আমি ইহ-পরকালের কথা, ঘর-সংসারের কথা, স্ত্রী-পুরুষের কথা ভুলিয়া গেলাম। কেবল একদৃষ্টে সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত রমণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া চলিলাম। আগে পথগুলা বড় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল, এখন যেন জ্ঞান হইতেছে, গাড়ী কি এত দ্রুতও যায়! ইংরেজের বুদ্ধিতে বাজ পড়ুক—এত নিকটে নিকটেও কি ষ্টেশন করে; ভয়—পাছে রমণী কোন ষ্টেশনে নামিয়া যান।

স্ত্রীলোকটি একটু এদিক ওদিক করিতেছেন, আর—সেই পোড়া চাহনিতে আমারই দিকে চাহিতেছেন। সে চাহনি আমার মরমের পরতে পরতে আগুন জ্বালিয়া দিতেছে। আমার আর চিত্তের স্থিরতা নাই। হৃদয়ে প্রেমের বাণ ডাকিয়া উঠিল। প্রেমের সমস্ত লক্ষণেরই বিকাশ প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে কখন গাহিতেছি, "নয়নেরি দোষ কেন, আঁখি কি ম'জাতে পারে না হ'লে মন মিলন।"—কখন গাহিতেছি, "শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি, ধ'রেছি নয়ন-ফাঁদে।" কখন ভাবিতেছি, "পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার।" কখন ভাবিতেছি, বৃন্দাবনের মধুর রস আমার করতলগত—কেন না, এই ত প্রেম। দেখিতে দেখিতে উভয় হৃদয়ে বাহার ঘাত প্রতিঘাত হইল,—দেখিতে দেখিতে নয়নের পথে মরমে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ইহাকেই কি অহৈতুকী প্রেম

বলে না? ইহার আর হেতু কি আছে! হেতুত টাকা—উপকার! সে আশা ত উভয়ের কাহারও নাই। কেবল "শুধু চোকে চোকে।"

আর পারি না—"সখিরে! শীতল বলিয়া সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"—চাই; ঐ অনিন্দ্যসুন্দরী আমার হৃদয়-সরসির প্রভাত-প্রফুল্ল নলিনীকে চাই।

মেঘ চাহিতেই জল। রমণী বঙ্কিমভাবে গ্রীবা বাঁকাইয়া ইঙ্গিতে আমাকে তাহার নিকটে ডাকিলেন। আমি মরিলাম—আর উঠিতে পারি না। আমার সমস্ত শরীরের রক্ত একেবারে, এক মুহূর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু বসিয়া থাকা ত চলে না—গুরু পুরোহিত ডাকিলে বরং বিলম্বে যাওয়া সাজে,—এ ডাকে কি থাকা যায়। আমি উঠিয়া পড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলাম।

আমি নিকটে গেলে, রমণী গাত্রাবরণ বস্ত্রখানি উন্মোচন করিলেন। হরি! হরি! এ কি!—এ যে সত্তর বৎসরের বুড়ী! আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম। হায়! আমার এ কি হইল? সারাটি রজনী জাগিয়া, সারাটি পথ যাহার মুখের দিকে চাহিয়া কত প্রেম, কত আশা, কত বিরহ, কত দীর্ঘশ্বাস বুকে করিয়া আসিলাম,—সে কি এই সত্তর বছরের বুড়ী!

বৃদ্ধা অতি নম্রস্বরে কহিল,—"কি গো! অত প্রেম কোথায় গেল? আমার উপরে কি জন্য ঘৃণা হইল? যুবতী হইলেই বৃদ্ধায় পঁহুছায়। বৃদ্ধারা যে ভুঁইফোড়, তাহা নহে। আমিও এক সময়ে যুবতী ছিলাম। আরও শোন,—আমি চিরকালই আছি, চিরকালই থাকিব। যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা এ সমুদয় ভৌতিক পরিবর্ত্তন মাত্র। তবে কেন তোমার এ মতিচ্ছন্ন!

শুনিতে চাহি না,—কিছু শুনিব না। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে-ছিলাম; সহসা "বাবু কুলীর" বিকট চীৎকারে চৈতন্য হইল। চাহিয়া দেখি, শেয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিয়াছে। লোক জন সব নামিয়া যাইতেছে,—একজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি নামিবে না?"

কোথায় আমার জুতা, কোথায় আমার ছাতা, কোথায় আমার কাপড় জামা—সকলে আগেই চলিয়া গেল; আমার গুছাইতেই কত দেরি।

অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে চাহিয়া দেখি,—বুড়ি প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে। পাছে আবার কিছু বলে ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া সেই অন্ধকার পথ বহিয়া ছুটিয়া চলিলাম। বুড়ী যেন তখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে! তখনও যেন আমি শুনিতে লাগিলাম,—সেই বুড়ি চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া রবির প্রেমের গাথা গাহিয়া বলিতেছে,—

"এস বা না এস, ভুলে থেক সখা
আমি ত ভুল্‌তে পার্‌বো না।'

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্মশান।

(১)

রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!
ভীষণ সংসার-ক্লেশে, উদ্‌ভ্রান্ত আকুল প্রাণে,
আসি যবে তব পাশে নাশ দুখরাশি,
ভব-মরুভূমে তুমি শান্তির সরসী।
রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!

(২)

রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!
হিংসা-দ্বেষ-প্রতারণা, স্বার্থের গরল-জ্বালা,
দম্ভ-মদ-অভিমান মাৎসর্য্যের মসি——
লেখা নাহি অনুমাত্র তব অঙ্গে মিশি।
রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!

(৩)

রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!
কিবা ধনী কি নির্ধন, কি রাজেন্দ্র কি রাখাল,
কি পর্ণকুটীরবাসী কি হর্ম্ম্যবিলাসী,
সবে সমভাব তব হেরি দিবানিশি।
রে শ্মশান, তোর আমি বড় ভালবাসি!

(৪)

রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!
কি মহান্ দৃশ্য তুমি, মর্ত্ত্য মানবের তরে,
উন্মুক্ত রেখেছ সদা ব্রহ্মাণ্ডবিলসি,
ধরিয়াছ কি গভীর জ্ঞানের আরশি।
রে শ্মশান, তোয় আমি বড ভালবাসি!

(৫)

রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!
উলঙ্গ দশনপাঁতি, করাল নৃমুণ্ডমালে,
খল খল মৃদু মৃদু সুমধুর হাসি
মানবের পরিণাম প্রকটিছ বসি।
রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!

(৬)

রে শ্মশান. তোয় আমি বড় ভালবাসি!
দয়ার নিদান তুমি, তাপদগ্ধ মানবের,
অকপট অদ্বিতীয় হিত অভিলাষী;—
হর যত শোক-তাপ শ্রীকর পরশি।
রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!

(৭)

রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!
কুলীশ-কঠোর হৃদি, এরূপ অন্যায় আখ্যা,
যে দেয় তোমায় হায় সে বড় কুভাষী,
কে দয়াল তব সম এ ব্রহ্মাণ্ডবাসী?
রে শ্মশান, তোয় আমি বড ভালবাসি!

(৮)

রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!
ভীষণ সংসারক্লেশে, উদ্‌ভ্রান্ত আকুল প্রাণে,
আসি যবে তব পাশে নাশ দুখরাশি,
ভব-মরুভূমে তুমি শান্তির সরসী।
রে শ্মশান, তোয় আমি বড় ভালবাসি!

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

সংসর্গ।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

পাঠক! পূর্ব্বাপর বর্ণিত বিষয় হইতে আমরা অবগত হইতে পারিব যে, উদাহৃত গল্পের পক্ষীর ন্যায়,—আমাদিগের চরিত্রও কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় এই তিনটী কাল মানব-জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তনের হেতু,—সময়ক্রমে ও স্বাভাবিক কারণে উহারা মানব-হৃদয়ের এক একটী উচ্ছৃঙ্খল রাজা। সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে উহার কার্য্যবলী, হয়—মার্জ্জিত না হয়, সংস্কৃত অথবা কলুষিত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকালে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির সংসর্গে লালিত পালিত হই। সুতরাং তখন হইতেই তাঁহাদিগের চরিতাবলী আমাদিগের হৃদয়ে সংক্রামিত হইতে থাকে। জীবনের এই অংশই, চরিত্র-গঠনের উপযুক্ত কাল। বিশেষতঃ, শিশুকালের স্বভাব ও সংস্কারগুলি, প্রায়ই চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। চারা অবস্থায় গাছকে যে ভাবে রাখিবে, উহা বর্দ্ধিত হইয়াও যেমন সেই অবস্থা পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ বাল্যকালে পিতা মাতা হইতে যেরূপ স্বভাব ও সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, বড় হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই হেতু প্রত্যেক পিতা-মাতা বা অভিভাবকবর্গের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যেন স্ব স্ব সন্তান সন্ততিদিগের সমক্ষে সৎআদর্শ প্রদর্শন করেন। যে হেতু, যখন মানব শিশু জীবনের প্রথম দিনে, সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে প্রথম উদিত হয়, তখন সে জানে না ও বুঝে না, সে কোথায় আসিয়াছে ও তাহাকে কি করিতে হইবে। তখন তাহার মনের অবস্থা নির্ম্মল ও নিষ্পাপ। কোনরূপ ভাবনা বা চিন্তা তাহার সেই সুন্দর সুনির্ম্মল হৃদয়ে কালিমার ছায়া সম্পাতেও সমর্থ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, চিরদিনের তরে শিশুর হৃদয় নির্ম্মল ও নিষ্পাপ থাকিবে, এরূপ নহে। শিশুর স্বাভাবিক নির্ম্মল মনে যদিও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কোনরূপ সংস্রব নাই; যদিও তাহার অন্তর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, তথাপি পূর্ব্বজন্মফলোদ্ভূত ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট-বিধায়ক সুনির্ম্মল মনোময় মনোদর্পণ তাহার হৃদয়ে সতত বিরাজিত এবং অনুকরণ-বৃত্তির সহিত তাহা সংশ্লিষ্ট। এই অত্যাশ্চর্য্য মনোদর্পণ অলক্ষিতভাবে সংক্রমণ প্রণালীতে সংসর্গজ ঘটনা সমূহের বিবিধ মূর্ত্তি আলোকচিত্রের ন্যায় চিরদিনের তরে

তাহার হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া রাখে, সুতরাং শিশুর এতাদৃশ মানশ্চক্ষুর সমক্ষে সৎসংসর্গ-সম্ভূত সুন্দর দৃশ্যাবলী ব্যতীত অসৎসংসর্গের কুৎসিত কালিমাময় চিত্র অঙ্কিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই হেতু আবার বলিতেছি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা যে কোন অভিভাবকের কর্ত্তব্য,—সাধু ব্যবহারের অবতারণা দ্বারা তাঁহারা যেন নিজ নিজ অধীন শিশুদিগের চরিত্রগঠন বিষয়ে সতত সচেষ্ট রহেন। ইহার পরিণাম ফল, তাঁহাদিগকে সরস সুমিষ্ট আস্বাদে অনুক্ষণ পরিতৃপ্ত রাখিবে; এবং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনও সুখময় করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পিতামাতা আমাদিগের মনোদর্পণের নিকটস্থ পুরোবর্ত্তী আদর্শ। অনুকরণবৃত্তিপ্রিয় মানব, অনুক্ষণ সেই আদর্শে আপনার বাল্যচরিত সংগঠন করে। আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি ও প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে যে, পিতা-মাতা সচ্চরিত্র হইলে, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও সেইরূপ সচ্চরিত্র হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পিতা মাতার চরিত্র মন্দ হইলে, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও সেইরূপ আপনার পিতৃ-মাতৃ-চরিত্রের ছায়াময়ী মূর্ত্তি আপনাদের হৃদিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখে; পরে তাহাদের জীবন-নাটকের প্রত্যেক অভিনয় ব্যাপারে ঐ সকল অনুকরণের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বাল্যজীবন, যাহাদের সংসর্গে অতিবাহিত করিতে হয়, তাহারা যেন শিশুর নিকট অসাধু আদর্শ প্রদর্শন না করেন। প্রত্যহ তাহার নিকট সতত সৎ আদর্শ আনয়ন করা ও সদ্বিষয়ের আলোচনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আমরা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের সংস্রবে বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত বিবিধ কারণে আমাদিগকে অচিরেই তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যামন্দির এবং অর্থের জন্য প্রভুগৃহে যথাক্রমে কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং এতাদৃশ অবস্থার শিক্ষক ও সহধ্যায়ীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অধিক সময় তাঁহাদের সংসর্গেই থাকিতে হয়। কিন্তু সংসর্গের কি মহিয়সী সংক্রমণ ক্ষমতা! অনুকরণ-বৃত্তির কি আশ্চর্য্য নিপুণতা!! মানব বিদ্যালয়ে থাকিয়াও শিক্ষক এবং ছাত্রগণের চরিত্রগত বিষয় সমূহ আপনার হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। এই হেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহধ্যায়ী ছাত্রবৃন্দের চরিত্র ভাল হওয়া

একান্ত প্রয়োজন ;—অন্যথায়, তাহার চরিত্র কলুষ-কালিমায় অনুলিপ্ত হইবে। দাসত্ববৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা।—পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহৃদয় সহধ্যায়ীবর্গ, আমাদের চরিত্র গঠনের প্রধান সহায়। এতদ্ভিন্ন বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদ্বান ও জ্ঞানবান ব্যক্তির গুণাংশ অনুকরণ করিতে সমর্থ অথবা অপারগ হই না কেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অগ্রে তাঁহাদের চালচলন, ভাব ভঙ্গী, আহার বিহার প্রভৃতি অনুকরণ করিয়া থাকি। এই হেতু তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখিতেছি।

বিদ্বান হইলেই যে মানব সচ্চরিত্র হইবে, তাহা সর্ব্বত্র বলা যাইতে পারে না। আমরা, এমন অনেক দেখিয়াছি যে, কত বিদ্বান ব্যক্তি, সামাজিক নিয়মের ব্যভিচার দ্বারা আমাদিগের দেশীয় যুক্তিপূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খল ছেদন করতঃ সামাজিক বন্ধন শিথিলীকৃত করিতেছেন। আর সেই আদর্শ লইয়া, বিশেষতঃ—অমুক শিক্ষিত হইয়া এরূপ করিয়াছেন, আমরা কেন না করিব, এরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া, অনেকেই তদনুসারে নিজ চরিত্র প্রস্তুত করিয়া, ঐ দলের পুষ্টিসাধন করিতেছে। তাই এখন আমাদের সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে ও সামাজিক যুগান্তরে প্রাচীন পদ্ধতি সকলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আবার, বিদ্বান লোকের সংসর্গে মানবসমাজ উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানেও আরোহণ করিতেছে, জ্ঞানের নির্ম্মল আলোকে কত কুসংস্কাররূপ অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই হেতু বুদ্ধিমান মানব, তুমি জলৌকাবৃত্তি অবলম্বনে মানব হৃদয়ের সারাংশ গুণরত্ন সংগ্রহে চেষ্টিত থাকিও, কদাচ অসার অংশ গ্রহণ করিও না।

সংসর্গের দোষে বা গুণে মানবের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে, সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে পড়িয়াই আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জাতীয় বৈষম্য উঠিয়া যাইতেছে, খাদ্যাখাদ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অভাব মানব-সমাজে মনোমালিন্যের হেতু ঘটাইতেছে। মানব-অন্তরে সংসর্গ সম্ভূত ঘটনাবলীর এতাদৃশ পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা পরিদর্শনে বোধ হয়, মানব-হৃদয় একটি উৎকৃষ্ট সরস উর্ব্বর ভূমি, উহাতে যেরূপ বীজ রোপণ করিবে, তাহাই অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও শেষে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। এই বৃক্ষ

প্রসূ ফল যদি সুমিষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ ক্ষেত্রে সদ্বীজ রোপিত হইয়া সংক্রমণ প্রণালী সহযোগে সদুপদেশরূপ সুধার ধারায়, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর যদি কুফল ফলে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ ক্ষেত্রে অসৎ বীজ রোপিত হইয়া সংক্রমণ প্রণালী সংযোগে অসৎ উপদেশরূপ দুর্গন্ধময় কর্দ্দম-কলুষ-বারি-সিঞ্চনে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শেষে বিষময় ফলোৎপাদক বিষবৃক্ষের উৎপাদন করিয়াছে। এই বৃক্ষ ফলের আস্বাদে, মানব কখন ঘৃণায়, কখন লজ্জায়, কখন বা অসহ্য যন্ত্রণায় সতত অস্থির রহে।

তাই বলি মানব তোমরা যেন সাধ করিয়া আপন হৃদয়ে বিষবৃক্ষ রোপণ করিও না। অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগে যথাসাধ্য সচেষ্ট রহিও এবং বিষম সংক্রামক ব্যাধিজ্ঞানে সতত উহা হইতে দূরে থাকিও। সংসর্গের দোষে ভরত মুনির কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা মনে রাখিও। পক্ষান্তরে সৎসংসর্গ বা সাধুজনসহবাসে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না। সাধুজনসহবাসের অনেক গুণ। তাই কোন কবি বলিয়াছেন,—

"ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি কুসুমের সনে,
তারেও মস্তকে করে যত সাধুগণে।
কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকত মণি-শোভা করয়ে ধারণ,
সেইরূপ সাধু সহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব।"

এখন পাঠক! তুমি সৎ ও অসৎ সংসর্গের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া যদি স্বকীয় জীবন-কুসুমের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে প্রচারিত করিতে বাসনা কর, তবে সৎ সংসর্গের অনুপম মৃদুমন্দ প্রবাহিত সুশীতল পবনের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে তুমি সকলের মন প্রাণ শীতল করিতে পারিবে, অতুলনীয় সুখ পাইবে এবং তোমার জীবন-বৃক্ষে কত সুফল ফলিবে, যাহার অমৃতময় আস্বাদে জগজ্জন মোহিত হইয়া সতত তোমার গুণগান দ্বারা মানব-চরিত্র সংগঠন বিষয়ে সকলের সহায়তা করিবে।

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

জন্মাষ্টমী।

ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হয়ে রাজা পরীক্ষিত।
আইলেন গঙ্গাতীরে করিতে বিহিত॥
স্বপুত্রেরে রাজ্যভার করিয়ে অর্পণ।
বসিলেন গঙ্গাতীরে দেখিয়া নির্জ্জন॥
এথা হরি দয়াময় হইয়া কাতর।
পাঠালেন শুকদেবে রাজার গোচর॥
আইলেন ব্যাসসুত যথায় রাজন।
বসিয়া আছেন করে প্রায়োপবেশন॥
রাজা দেখি অবধূতে কহে সম্ভাষিয়ে।
তারিতে আইলে প্রভু তরণী লইয়ে?
শুকদেব বলে আমি নহি কর্ণধার।
পাঠালেন কর্ণধার করিবারে পার॥
শ্রীমদ্ভাগবত তরি আসিয়াছি লয়ে।
শুনিলে ইহার কথা যাবে পার হয়ে॥
শুন শুন কহি রাজা জন্মাষ্টমী কথা।
ঘুচিবে যাহাতে তব ভবপার-ব্যথা॥

মথুরায় কংশ রাজা,
পীড়িত করিয়ে প্রজা,
ছিল হয়ে পাপী অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণেতে প্রবল দ্বেষ,
কৃষ্ণনাম শূন্য দেশ,
করিয়া করিল ধর্ম্মশূন্য॥
যেবা করে কৃষ্ণনাম,
রাজা করে অপমান,
বিধিমতে করিয়া পীড়ন।
নাম যার কৃষ্ণদাস,
কংসরাজ্যে তুলে বাস
যায় দূরে করি পলায়ন।

তখন গাভিরূপিণী,
হইয়ে ধরা জননী,
যান ত্বরা বিধির নিকটে।
গিয়া ধনী ব্রহ্মলোকে,
ব্রহ্মা যথা ব্রহ্মলোকে,
নিবেদিল তথা করপুটে॥
শুন শুন পিতামহ,
তনয়ায় ক্ষমা দেহ,
মর্ত্তে পুন নাহি যাব আমি?
বিধি তব সৃষ্টি যায়,
আশু প্রভু রাখ পায়,
কলঙ্কি নতুবা হবে তুমি॥
শুনে ব্রহ্মা ত্বরা করি,
ব্রহ্মলোক পরিহরি,
গিয়া ত্বরা বৈকুণ্ঠ সভায়।
কাতরে কহেন বিধি,
রক্ষা কর দয়ানিধি,
নইলে দাসের সৃষ্টি যায়॥

স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি কহেন ধাতারে,
ধরায় জনম লব দেবকী উদরে।
তোমাদের দুখনাশ করিতে ত্বরায়,
কংসেরে বধিতে আমি যাব মথুরায়।
নিজবাক্য অনুযায়ী দয়াময় হরি,
অবতার হলেন গোলোক পরিহরি!
দেবকীর অষ্টম গর্ভেতে ভগবান,
আসিয়া দয়াময় হলেন অধিষ্ঠান।
শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে,
ভূমিষ্ঠ হলেন প্রভু অন্ধ যামিনীতে।

বসুদেব দেবকীর জন্মিল বিস্ময়,
শিহরিল দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়।
দেবকী কহিছে কৃষ্ণ সম্বর ও রূপ,
তব জন্ম মোর গর্ভে অতি অপরূপ।
দেবকীর নেত্রবারি দেখি নারায়ণ,
বলেন ভুলেছ কি মা পূর্ব্ব বিবরণ।
তব তপস্যায় আমি হইয়ে সন্তুষ্ট,
এসেছিনু করিবারে তব মন তুষ্ট।
পুত্র হতে বর তুমি মাগিলে আমায়,
সেই বরে আমি তব হয়েছি তনয়।
ত্যজহ কংসের ভয় ক'র না রোদন,
শীঘ্র আসি করিব মা বিপদ ভঞ্জন।
শুভযাত্রা কর মোরে লইয়া এখন,
রাখিয়া আইস মোরে নন্দ-নিকেতন।
নন্দরাণী যোগমায়া করিয়ে প্রসব,
হয়েছেন অচৈতন্য প্রায় যেন শব।
আমারে রাখিয়া তথা আন যোগমায়া,
কিছু না জানিতে যেন পারে নন্দজায়া।
এত শুনি বসুদেব হয়ে হরষিত,
পুত্র কোলে নদী তীরে হ'ল উপনীত।
কাতর হলেন দেখি ভীষণ তরঙ্গ,
যমুনা করিছে যেন ভয়ানক রঙ্গ।
টিপি টিপি বৃষ্টিধারা পড়িতেছে গায়,
দেখিয়া অনন্ত ফণা ধরিল মাথায়।
ভক্তের বিপদ জানি এথা ভবদারা,
শৃগালিনী মূর্ত্তি মাতা ধরিলেন ত্বরা।
আসিয়া যমুনাকূলে জম্বুকি তখন,
অনায়াসে পার হ'ল দিয়ে সন্তরণ।
দেখিয়া বসুর মনে আনন্দ জন্মিল,
নন্দনে লইয়া কোলে জলে পদ দিল।
যমুনার সাধ পূর্ণ করিবারে হরি,
পিছলিয়া পড়িলেন ক্রোড় পরিহরি।
হারায়ে জীবনকৃষ্ণে যমুনা-জীবনে,
হলেন মমতাশূন্য আপন জীবনে।
কিছুকাল পরে হরি উঠিলেন ভেসে,
দেখিয়া সন্তানে বসু আনন্দেতে ভাসে
নন্দনে লইয়া কোলে আনন্দিত মনে,
উপনীত হইলেন নন্দের ভবনে।
প্রবেশি সূতিকাগৃহে তনয়ে রাখিয়া,
ফিরিলেন ত্বরা কোলে লয়ে যোগমায়া
যশোদার কোলে কন্যা সঁপে বসু গিয়ে,
নিদ্রিত প্রহরী যত উঠিল জাগিয়ে।
দেবকী প্রসব কথা কহিল রাজায়,
পাপী কংস কন্যা ধ্বংস করিবারে যায়
দেবকী কাঁদিয়া বলে দাদা মহাশয়,
কন্যাটিকে ভিক্ষা তুমি দেহ গো আমায়
দেবকীর কথা শুনি রাগান্বিত হয়ে,
ক্রোড় হতে কন্যা কংস লইল কাড়িয়ে
মারিতে উদ্যত কংসে দেখি যোগমায়া,
উঠিলেন শূন্যমার্গে ত্যজি নারীকায়া।
অষ্টভুজামূর্ত্তি দেবী করিল ধারণ,
দেখিয়া কংসের হ'ল আকুলিত মন।
ডাকিয়ে কহেন শিবে শুন মূঢ় কংস,
আমার শাপেতে তুই আশু হবি ধ্বংস
যারে নাশিবারে দুষ্ট করেছ মনন,
গোপনে গোকুলে এবে বাড়িছে সে জন
এত বলি যোগমায়া করিল প্রস্থান,
লোক পাঠাইল রাজা করিতে সন্ধান।
এদিকে গোকুলপুরে পাইয়া চেতন,
নন্দরাণী বক্ষে সুতে করিল ধারণ।

নন্দ এসে কোলে তুলে নিল নীলমণি,
উপানন্দ সানন্দে বিলায় রত্নমণি।
কৃষ্ণচন্দ্র উদিলেন গোকুল আকাশে,
ঘুচিল তিমির জাল চন্দ্রের প্রকাশে॥

সম্পাদক।

নন্দোৎসব।

ঠেকা।

(মুখ) মহানন্দে গোপবৃন্দে প্রেমে পুলকিত হয়।
গোকুলে গোলোকচাঁদের হইল উদয়।
(চড়া) শ্রীদামের শাঁপ উপলক্ষে, শ্রীরাধার মান করতে রক্ষে,
দেবের দুঃখে, উভয় পক্ষে, ধরার প্রতি হলেন সদয়।
(খাদ) গোলোক পরিহরি মাধব ব্রজবালক হয়।
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিতে এলেন নন্দালয়।
(চড়া) নন্দ যশোমতীর পূর্ণে, পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ হলেন,
বাঞ্ছাপূর্ণকল্পতরু ভক্তাধীন দয়াময়।

একতালা।

মায়ায় মোহিত হয়ে রাণী নিদ্রায় অচেতন।
(মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, সারানিশি মায়ায় মুগ্ধ হয়ে)
হ'লো চৈতন্যের পরশে, চৈতন্য প্রকাশে,
চিদানন্দরূপ দেখি বিস্ময় মন।
(কখন প্রসব হলেন তাঁর কিছুই জানেন না)

এক ঠুকি।

কিবা রূপ অপরূপ দেখি। হায় গো, একি বহুরূপীর রূপ না কি।
কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত, মুখচন্দ্র প্রকাশিত,
হেরি গগনচন্দ্র ভূলোক এলো।
(চরণ নখরে পতিত হ'লো)
জিনি নীল ইন্দীবর, যুগল নয়ন সুন্দর,
কুরঙ্গিনী লাজেতে পলায়।
(বলে আমার নেত্রের গৌরব ঘুচাইল)

ভৃগুপদ চিহ্ন হেরি, হৃদি পরে আহামরি,
ধারণ করেছেন অকাতরে।
(ব্রাহ্মণের মান বাড়াইতে)
মস্তকে মোহনচূড়া, তাহে শিখি-পুচ্ছ বেড়া,
দ্বিভুজে মুরলী মনোহর।
(আমি কি তুলনা দিব তার)
কটিতটে পীতাম্বর, চরণে ঘুঙ্গুর নূপুর,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন তায়।
(হেরে রাণীর ব্রহ্মভাবের উদয় হয়)
তাহা দেখি বিস্ময়, ব্রহ্মভাব সম্বরয়,
তখন রাণীর বাৎসল্য যোগায়॥
(পুত্র ধরা হতে কোলে লয়) নন্দরাণী।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপহার ফুরাইল।—এবার আলোচনার বিশ্ববিমোহন চারিখানি উপাদেয় উপন্যাস প্রাপ্ত হইয়া গ্রাহকগণ সকলেই সুখ্যাতি করিতেছেন; গ্রাহক-সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি; কেবল মাত্র ১৷৽ টাকা বার্ষিক মূল্য লইয়া প্রতি মাসে আলোচনার ন্যায় একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ও এরূপ সুবৃহৎ চারিখানি উপন্যাস কেহ কখন দিতে পারেন নাই। উপহার পুস্তক আর বেশী নাই; আমরা ৺ পূজার পর আর কাহাকেও উপহার দিতে পারিব না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূজার পূর্ব্বে মূল্য পাঠাইয়া উপহার গ্রহণ করুন, বিলম্বে নৈরাশ হইবার সম্ভাবনা।

মৃত্যু।—অরণ্যে নিত্য নূতন কত ফুল ফুটিতেছে; কত ফুল ঝরিয়া যাইতেছে, পড়িতেছে; তাহার সংখ্যা কে করে? এই মরজগতে মরণের হাত কেহই এড়াইতে পারে না; এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইবা আলোচনার বিশিষ্ট বন্ধু বাবু কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় আর ইহসংসারে নাই। বিগত

১৩০৯ সালের ১৫ই পৌষ, ৬৫ বৎসর বয়সে নশীপুর মোকামে মহাত্মা কৃষ্ণলাল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; কৃষ্ণলাল বাবু জমীদারী কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, কনিষ্ঠ এখন জীবিত, কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরশোকে মুহ্যমান। মুর্শীদাবাদের অধীন কান্দী সবডিভিসনের নিকটবর্ত্তী বাতুর গ্রাম মহাত্মা কৃষ্ণলালের জন্মস্থান। কৃষ্ণলাল বাবুর তিন পুত্র, এক কন্যা হইয়াছিল; প্রাতঃস্মরণীয় দানশীল নশীপুরাধিপতির বর্ত্তমান নাজীর বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; কন্যাটী দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র অল্প বয়সেই মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কনিষ্ঠ পুত্রটী বর্ত্তমান। কৃষ্ণলাল বাবু কলির ব্রাহ্মণ হইলেও জীবনের অধিকাংশ সময় আহ্নিক পূজায় কাটাইতেন; ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল। ৩০।৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার গৃহিণীর অকাল মৃত্যু হইলে, সংযমী কৃষ্ণলাল ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি পবিত্র ছিল; বিনয় নম্রতা প্রভৃতি যাবতীয় মহৎ গুণ তাঁহার জীবনের অলঙ্কার ছিল; যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিত—সেই প্রীত হইত। দরিদ্রকে অন্নদানে কৃষ্ণলাল কখন কাতর হইতেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, আপনি না খাইয়া অপরকে খাওয়াইতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, এরূপ একটী মহাত্মার লোকান্তর গমনে আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছি, ভগবান তাঁহার পবিত্র আত্মার সদ্গতি প্রদান করুন এবং তাঁহার কৃতী ও পিতৃপথানুবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র বাবু ও কনিষ্ঠ পুত্রের চিরশান্তিবিধান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রাপ্তি-স্বীকার।—আমরা কলিকাতার দার্শনিক কবিরাজ—শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এক কৌটা "সিদ্ধ মোদক" উপহার পাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—ইহা কোষ্ঠ কাঠিন্য, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি রোগের বিশেষ ফলপ্রদ মহৌষধ। যাঁহারা উক্ত রোগে কষ্টভোগ করিতেছেন,—তাঁহাদিগকে আমরা এই ঔষধ সেবন করিতে অনুরোধ করি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আগমনী।—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হইয়া আবার সেই সাধের আশ্বিন মাস সমাগত। প্রকৃতি সতীর দীনভাব আর নাই,—ফল ফুলে পরিশোভিত প্রকৃতি সতী আবার যেন রাজরাণী হইয়া মাতৃপূজার আগমনী মন্ত্র গাহিতেছেন। সম্বৎসর পরে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজননী তাঁহার দীনহীন আর্ত্ত সন্তানগণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার মানসে তিন দিনের জন্য মর্ত্ত্যে আবির্ভূতা হন, এই জন্য আশ্বিনমাস আমাদের এত আদরের, এত সুখের; চিরবিশুষ্ক বাঙ্গালী-হৃদয় আবার আনন্দরসে সরস হইয়াছে; মৃতপ্রায় বাঙ্গালী আবার সঞ্জীবিত হইয়া মায়ের আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে। এস মা ভবভয়হারিণী ভুবনেশ্বরী, ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ কর, আমরা তোমার দেবদুর্লভ রাতুল চরণ দর্শন করিয়া দেহ মন পবিত্র করি।

মাতৃপূজা।—আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বাঙ্গালীর মহাপূজা বলিয়া প্রখ্যাত। কেন না, এরূপ আনন্দ, এরূপ সার্ব্বজনীন মহোৎসব আর কোন পূজায় নাই বলিয়া এই দুর্গোৎসব সকল পূজার শ্রেষ্ঠ এবং জগতে অতুলনীয়। এমন করিয়া একমাস ধরিয়া "মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন" বলিয়া সকলের কাতর আবাহন আর কোন্ পূজায় দেখিতে পাওয়া যায়? এবার ১১ই আশ্বিন, বাঙ্গালী মায়ের অভয় চরণ পূজা করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছে, পুত্রগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অসুরদলনী মা আমাদের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিবার জন্য দক্ষিণে বিঘ্নবিনাশন গণপতি, অজ্ঞান-নাশ করিবার জন্য অজ্ঞাননাশিনী বাক্‌বাদিনী এবং আমাদিগকে দরিদ্র দেখিয়া বামে ধনদাত্রী লক্ষ্মী এবং আমাদিগকে উৎসাহিত ও সতেজ করিবার জন্য ষড়ানন সমভিব্যাহারে আসিয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। আ মরি মরি! এ রূপ দেখিলে প্রাণে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। মা! এবার তুমি গজে আগমন করিয়াছ—পৃথিবী জলময়ী, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইলেই তোমার শুভগমনের সমস্ত ফল উপলব্ধি হয়; আমরাও কৃতার্থ হই।

গ্রাহকগণের প্রতি।—আলোচনার ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইল; এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী; গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টির উপর পত্রিকার স্থায়ীত্ব নির্ভর করে, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টির ব্যতিক্রম হইলেই পত্রিকা অকালে লয় প্রাপ্ত হয়। আমরা আজ সাত বৎসর "আলোচনা"কে যে জীবিত রাখিতে পারিয়াছি, গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টিই তাহার মূলীভূত কারণ; অতএব গ্রাহক মহোদয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় অনুকম্পা পুরঃসর স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। উপহার প্রায় শেষ হইল, বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা, অতএব সকলে সত্বর হউন।

উপাধীলাভ।—আলোচনা সমিতির পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় কৃতকার্য্য হওয়ায়, "ভক্তিবিনোদ" উপাধীলাভ করিলেন।

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।—আমাদের জনৈক কর্ম্মচারী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন ভুগিতেছিলেন, কোনও ঔষধে তাঁহার উপকার হয় নাই; সম্প্রতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে এক বোতল "এডওয়ার্ডস টনিক" নামক ঔষধ আনাইয়া তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়ায়, উক্ত কর্ম্মচারিটী ঐ ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আমরা ঔষধের রোগ-নাশক শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সকলকে আমরা মুক্তকণ্ঠে এই ঔষধ সেবন করিতে অনুরোধ করি।

হাওড়ার আদালত।—হাওড়া আদালতের বিচার কার্য্য দিন দিন কিরূপ শিথিলভাবাপন্ন হইতেছে, তাহা সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশ হইতেছে এবং সকলেই পাঠ করিতেছেন। সে দিন হাওড়ার ডেপুটী কলেক্টার প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের জনৈক দাসীর বিচার বাবু নিবারণ-চন্দ্র ঘটক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের এজলাসে কিরূপ ভাবে হইয়াছে; বিগত সপ্তাহের "হিতবাদীতে" বাবু জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। হাওড়ার ন্যায় প্রসিদ্ধ জেলায় এরূপ ভাবে বিচারবিভ্রাট হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়।

নূতন কবিরাজ।—কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের পুত্র—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি জাতীয় ব্যবসায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। যোগীন্দ্র-বাবু ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি নিশ্চয় আর্য্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্নতিলাভ করিয়া পিতার মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন। রোগীগণকে তিনি বিশেষ যত্নের সহিত দেখিয়া থাকেন, রোগ নির্ণয়ে তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে; তাঁহার অমায়িক প্রকৃতি ও মিষ্টভাষীতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাঁহার "অমৃতসার" অভিনব আবিষ্কার—ইহার গুণ অতুলনীয়। ইহাঁর ঔষধালয় ৩৬৭ নং অপার চিৎপুর রোড।

ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন।—খিদিরপুরের ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা মহাশয় এই মহৌষধ বিক্রয় করিতেছেন; আমাদের জনৈক বন্ধু এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। নানাবিধ জটিল রোগে তিনি এক প্রকার মৃতকল্প হইয়াছিলেন, "ইলেক্‌ট্রিক সলিউসনে" তাঁহার দেহে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয় এই মহৌষধ বিক্রয় করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ইহাঁদের অফিস—৬ নং শোনাই থাড়লেন।

ডিউক দাতব্য চিকিৎসালয়।—হাওড়ার অন্তর্গত সিংটী শিবপুর গ্রামে উক্ত চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল। প্রতিদিন প্রায় শতাধিক দরিদ্র রোগীগণ এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইত ও বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। এক্ষণে শুনা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্ট এই ঔষধালয়টী তুলিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছেন। হাওড়ার নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ন্যায়বান্ বিচারপতি; তাঁহার শুভাগমনে হাওড়া জেলার অনেক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। আশা করি, তাঁহার দ্বারা সিংটীর এই দাতব্য হাঁসপাতালটী রক্ষিত হইবে; ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বিচার কার্য্যে বিশেষ সুযশ আছে, এ কার্য্যেও আমরা তাঁহার সুযশ ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হইব।

আগমনী।

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

রাণি! ঐ এলো ঐ এলো তোমার উমাধন।
কর গো শোক সম্বরণ,—
আর ভেসো না গো আঁখিজলে,
চেয়ে দেখ নয়ন মেলে,
কোলে তুলে লয়ে হের চাঁদবদন। (উমার)
অঞ্চলে মুছায়ে উমার চাঁদবদন,
পুরবাসিনী ডাকি কর কর মঙ্গলাচরণ,
ধান্য-দূর্ব্বাদলে কর গো বরণ,
হাসিমাথা, মুখ হেরি জুড়াও গো জীবন,
সুগন্ধি-চন্দন জলে, করায়ে স্নান কুতূহলে,
সুসাজে সাজায়ে কর সাধ পূরণ।
উমা-সুত গুহ আর গণপতি,
উমা চেয়ে রাণী তোমার তারা আদরের অতি,
আধ হাসি হেসে ধায় তব প্রতি,
(উঠে) যুগল-কুমারে কোলে লও সতি,
মিলি যত পুরনারী, হুলুধ্বনি দেয় সারি,
(ঐ শোন) মঙ্গল-বাজনা রবে পূরিল ভবন।

আলেয়া—আড়া ঠেকা।

কেমনে মা মায়ে ভূলে ছিলি মা হর-নিবাসে।
বল উমা তাই আমায় বল মা, কেমন ছিলি সে কৈলাসে।
যে বরে সপেছি তোমায়,
(সে যে) গুণহীন অন্নহীন খ্যাপায়,
মনে হলে প্রাণ ফেটে যায়, আঁখি-তারা জলে ভাসে।
বৎসরান্তে এনে তোরে
কিছুদিন মম আগারে,
রেখে পুরাই মনের সাধ,
এ সাধ অন্তরে,—

খাওয়াই পরাই কোলে করি, আলো করা চাঁদমুখ হেরি,
সকল দুঃখ বারণ করি,
(কেবল) ডরাই খ্যাপা ভোলার ত্রাসে।
আয় মা কোলে উমাশশী,
মা বলে ডাক হাসি হাসি,
আধ আধ সুধাস্বরে জুড়া মম হৃদয় ,—
তুই মা আমার দুখ পাসরা, জীবনেরি ধ্রুবতারা,
আর যেতে দিব না তারা,
থাক্ মা আমার হৃদাকাশে॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

মায়ের পূজা।

আয় গো মা মহামায়া জগত-তারিণী,
আশাপথ চেয়ে আছি দিবস যামিনী,
গত সন কষ্টে গেছে, তাই মা এবার
নিদয় হইলে এত সন্তানে তোমার!
জ্ঞানদাত্রী বুদ্ধিদাত্রী ছিল না মা ঘরে,
তাই অত কষ্ট পেলে বিগত বৎসরে।
জনকের কথা আর কি বলি জননি!
বর্ব্বরের রাজা তিনি অসভ্যের খনি।
মামা দাদা খুড়া জ্যেঠা কি কহিব আর
বুদ্ধি নাই কারো ঘটে সব একাকার।
মায়ের গুণের কথা কি বলি জননি।
বুড়ী বেটী হদ্দ বদ্ দুষ্ট শিরোমণি।
বৌ(যেন)তাঁর বুকেরকাঁটা দুচখের বিষ
বৌএর সঙ্গেগণ্ডগোলেআছেন অহর্নিশ
সংসারের জ্বালায় মা হয়ে জ্বালাতন
গত বৎসর ভালরূপে হয়নি অর্চ্চন।
মা বাপের কর্ত্তৃত্ব গেছে, গৃহিণী এখন
স্বহস্তে করিতেছেন পূজা আয়োজন,
এবার,—ছোলা ভিজা পাকা কলা
হবে না মা খেতে,
আনা'য়েছি বিস্কুট
বিলাত হইতে।
আতব হবিষ্য ভাগ্যে হবে না তোমার
পাঁউরুটী শ্যামপিন যথেষ্ট যোগাড়।
চিনি বেল সরবৎ অসভ্য পানীয়!
সেরি হুইস্কীর কাছে নয় তুলনীয়।
কচু কাঁচকলা আর খাইতে হবে না,
বরাদ্ধ হয়েছে এবার উইলসন খানা।
ছাগশিশু রক্তপান হবে না এবার,
মোরগের যুশ মাংস হইবে আহার।
সুগন্ধি কর্পূর জলে নাহি প্রয়োজন,
সোডা লেমনেড এবার করিও গ্রহণ

'জয় মা' শব্দ এবার কাণে না শুনিবে,
'হিপ হিপ হুর্‌রে' রবে সবাই নাচিবে
ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশী হবে না সানাই
ব্যোম হাউয়েতে এবার বাহাদুরী
চাই।
তিলক চৈতন চটী পুরে না পশিবে,
দাড়ী, ঘড়ি, ভুঁড়িদের আদর দেখিবে
কাঙ্গালী বিদায় আর ব্রাহ্মণ-ভোজন
এ সব যন্ত্রণাভোগ হবে না কখন।
শশীমুখী বিধুমুখী মগ্নু গন্নু আর,
তোমার সম্মুখে কত মারিবে বাহার।
পৌরাণিক উপকথা হবে না শুনিতে
মাক্‌বেথের অভিনয় পাইবে দেখিতে
গিরীশ অমৃত মতি পাইবে না স্থান,
হিউ পিল কর্ক এঁদের হবে
অভিযান।
তামাকের কটুগন্ধ নাকে না পশিবে,
সিগ্‌রেট বার্ডসাই ধূমে আনন্দিত হবে
বিজয়ার কোলাকুলি হবে না এবার,
স্ত্রীপুরুষের সেক্‌হ্যাণ্ডে দেখিবে বাহার

এই ত আবার মাগো পূজার অবস্থা
নব গৃহিণীর এই নূতন ব্যবস্থা।
অভিনন্দন-পত্রে মাগো কয়টী প্রার্থনা
পূর্ণ করো, এ দাসেরে কর না বঞ্চনা।
দয়া করে এই বর দিও ভগবতি
পত্নীপদে চিরদিন থাকে যেন মতি।
সম্বন্ধী বাবুর কোন কষ্ট নাহি হয়
শ্বশুর শাশুড়ী যেন মহাসুখে রয়।
জনক জননীর দিও মা সুমতি,
সয় না যে চক্ষে আর তাঁদের দুর্গতি।
গঙ্গাস্নান জপমালা নিত্য যাগযোগ।
দেব-দ্বিজে ভক্তি করা ঐ মহা রোগ॥
এ রোগে ঔষধ মাগো
কোথাও না পাই,
না মরিলে তাঁরা আর
পরিত্রাণ নাই।
বিগত বৎসরে মাগো ছিলে চারিদিন,
এ বছর তুমি মাগো রবে তিন দিন।
আগামী বৎসর মাগো দশদিন থেকো
দাসের একথাগুলি মনে যেন রেখ॥

শ্রীসুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অহঙ্কার।

(১)

"নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ।" অহঙ্কারই পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শোক শান্তি, ত্রিতাপ প্রফুল্লতা ইত্যাদি পরিপূর্ণ সংসারের মূল কারণ। অহঙ্কার সংসার-বৃক্ষের মূল, এবং অন্যান্য সকলই শাখা প্রশাখা, লতা পল্লব, পুষ্প ও ফলস্বরূপ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষের ফল। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইহার বিকাশ মাত্র। বাসনা রসেতেই এই বৃক্ষ পুষ্ট হয়।

প্রবৃত্তি ভিত্তির উপর এই বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি স্বর্গীয় দূত যখন এই বৃক্ষকে নিবৃত্তিরূপ শান্তিময় ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করেন, তখন সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি দেবসেনা আসিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অহঙ্কাররূপ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ছেদন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে এ বৃক্ষের বিনাশ হয় না—যে পর্য্যন্ত না সৎগুরু ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা মূল ছেদন করেন, ও ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা সমূলে বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

(২)

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেব প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, কোন সময় যখন দেবগণ দানবজয়ী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই অন্তরে অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আমার শক্তি প্রভাবেই দেবসেনা দানবজয়ী হইয়াছে। তখন দর্পহারী ভগবান বাসুদেব শ্রীহরি অকস্মাৎ ছদ্মপুরুষরূপে দেবসভাতে উপস্থিত হইয়া, একখণ্ড তৃণ ধরিয়া সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন যে, "হে দেবগণ। তোমরা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ও পরে সকলে একত্র হইয়া এই তৃণখণ্ড বিনষ্ট করিতে চেষ্টা কর এবং আপন আপন ক্ষমতার পরিচয় দাও। তখন পবন সমস্ত বেগশক্তি প্রয়োগ করতঃ সেই তৃণ উড়াইতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে ও বরুণ ভাসাইতে অক্ষম হইলেন ও সকলে একত্র চেষ্টা করিয়াও, হেলাইতে বা নাশ করিতে পারিলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন যে, সকল দেবতা অপ্রতিভ হইয়াছেন, বৃথা আমি, আমার বজ্রের যে "অব্যর্থ বজ্র" বলিয়া যশঃ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অদ্য এই দর্পহারী পুরুষের সম্মুখে বিলীন ও মলিন করিব কেন? ইহার শরণাপন্ন হই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদেব-দেব বাসুদেব, ভগবান শ্রীহরিকে জানিতে পারিয়া যথাশক্তি স্তুতি স্তব করিয়া বলিলেন, হে প্রভো! আপনার যে অদ্য আমাদিগের দর্প বিনাশ করিতে প্রয়াস, এ কেবল আমাদিগের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ মাত্র, আমরা জানিলাম যে, আমরা সকলেই আপনার দাসানুদাস, আপনার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকি, ও মোহবশতঃ আমি করিলাম ভাবিয়া, অভিমানযুক্ত হইয়া স্বীয় অজ্ঞানতার পরিচয় প্রদান করি। বিভো, আপনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। আপনি নিজগুণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন

হউন। তখন শ্রীহরি দেবগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ করতঃ সকলের সম্মুখেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

(৩)

একদিন হনুমানের অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আমার শক্তিতেই এই সমস্ত কার্য্য হইতেছে। যখন অন্তর্যামী দর্পহারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জানিতে পারিয়া ভক্ত হনুমানের কল্যাণের নিমিত্ত আপন শক্তি সংহরণ করিলেন; হনুমান তখন বড় বড় প্রস্তর বহন করা দূরে থাকুক, নিজের শরীর বহন করিতে অক্ষম হইলেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রসাদে যথাযথ তত্ত্ব অবগত হইয়া অভিমানশূন্য হইলেন।

(৪)

শ্রীমদ্‌গুরুদেবের শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ভগবান শ্রীহরি কাহারও দর্প রাখেন না। হনুমান, গরুড়, প্রভৃতি ভক্তগণের নিজ প্রাণাধিকা দেবী সত্যভামার, এবং কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি প্রিয়তমা শ্রীরাধিকারও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, এমন কি, নিজের দর্পও রাখেন নাই। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতঃ রথচক্র ধারণপূর্ব্বক দর্পহারী নামের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন।

(৫)

এই স্থলে আমার একটী ভাব মনে উদয় হইতেছে। ভগবান শ্রীহরির ভক্তাভিমান ভয়ে এরূপে স্বীয় দর্পচূর্ণ করিয়াছেন, বুঝি মনে ভাবিয়াছিলেন, ভক্তগণ অভিমান করিতে পারেন যে, আমাদের এত লাঞ্ছনা করিয়া নিজের মানখানা প্রভু ষোল আনা রক্ষা করেন, অতএব আর এমন ভগবানকে ভালবাসিব না। বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার মানের কথা বুঝি মনে পড়িয়াছিল, যে একবার মানের দায়ে কখন যোগী সাজিয়াছেন, কখনও ধূলি ধূসরিত ও শ্রীপাদপল্লবে লুণ্ঠিত হইয়াছেন।

[মধুরেন সমাপয়েৎ।]

উদক ক্রিয়া।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

জন্মাষ্টমী তিথিতে ধরাধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল, এইজন্য এই তিথি এবং এই দিন মহাপবিত্র। এই দিনে তর্পণ করিলে যে ফল হয়, গয়াক্ষেত্রে শতবর্ষব্যাপী শ্রাদ্ধ করিলে তাহাই হইয়া থাকে।

তস্যাং তিথৌ বারিমাত্রং পিতৃণাং যঃ প্রযচ্ছতি।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন শতাব্দং নাত্র সংশয়ঃ॥

(ব্র, বৈ, পুরাণ—জন্মখণ্ড)

যাঁহারা নিত্য সম্পূর্ণরূপে তর্পণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিলে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"

তর্পণ করিবার জন্য উপবিষ্ট হইয়া, হিন্দু সন্তান প্রথমে যাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্য জল দেন, তাঁহাদের নাম শুনুন,—

দেবাযক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগা॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মেরতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

অস্যার্থ।—"দেবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, ক্রূর সর্প, সুন্দর পত্রশালী তরু সকল, সরীসৃপ, পক্ষি, বিদ্যাধর, জলচর জীবসমূহ, আকাশগামীগণ, নিরাহারী জীবপুঞ্জ, পাপীগণ, ধার্ম্মিকগণ প্রভৃতি সমুদয় জীবের তৃপ্ত্যর্থ আমি এই জল দিলাম।" পাঠক মহাশয়! তর্পণ ক্রিয়ায় হিন্দুসন্তানের বদান্য হৃদয়ের মহত্বটা একবার বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি? কি আশ্চর্য্য পরোপকার! কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! ক্রূর সর্প, অধম পাপী এবং রাক্ষস পর্য্যন্তকেও হিন্দুসন্তান জল দিতেছেন!

তাহার পরে তর্পণকারী কহিলেন,—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন।
কপিলশ্চাসুরঃ শ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।"

এই সকল জগৎপূজ্য মহর্ষিগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া তর্পণকারী মরীচি, অত্রি প্রভৃতির উদ্দেশে জলদান করেন। তদনন্তর যমতর্পণ করিতে হয়। তাহার পরে পিতৃগণের উদ্দেশে জল দিয়া, হিন্দুসন্তান কহিলেন,—

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্যদগ্ধাঃকুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তোয়েন তৃপ্তায়ান্তু পরাং গতিং॥
যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিনঃ॥

অনুবাদ।—"যে সকল জীব অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিয়াছে, যাহারা আমার বংশে জন্মিয়া (দুর্ভাগ্যবশতঃ) মরণের পরে শ্মশানক্ষেত্রে দাহ হয় নাই, তাহারা আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউন। মৃতবন্ধু, সম্পর্কহীন ব্যক্তি, পূর্ব্ব *জন্মের বান্ধব, ইহাঁরাও আমার জলে তৃপ্ত হউন।" এই মন্ত্রে অপঘাতে* মৃতব্যক্তির এবং মৃত শিশুদিগের জন্যও (অর্থাৎ যাহাদিগের দাহ হয় না) জল দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, এবম্প্রকার তৃষিত ব্যক্তিকেও জল দিতে ধার্ম্মিক হিন্দুসন্তান বিস্মৃত হয়েন না। কি আশ্চর্য্য উদারতা!!

তাহার পর হিন্দুসন্তান কহিতেছেন,—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনং।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

অনুবাদ।—"ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক ও ভুবন, সমস্ত দেবর্ষি, পিতৃমানব, মাতৃমাতামহাদি পিতৃবর্গ, সপ্তদ্বীপনিবাসী, কোটীকুলাতীত ব্যক্তিবর্গ এবং সমস্ত বিশ্বসংসার (স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি ত্রিভুবন) আমার প্রদত্ত এই জলে তৃপ্ত হউন।" পাঠক মহাশয়! এখন বলুন দেখি, আর কাহাকেও জল দিতে বাকী রহিল কি? হিন্দুর বদান্যতার, হিন্দুর জগদ্বিখ্যাত পরোপকার গুণের, পবিত্র সনাতন হিন্দুর বিশ্বজনীন উদার ভাবের এবং অখণ্ডনীয় হিন্দুশাস্ত্রের অতুলনীয় মহিমার, ইহা অত্যুজ্জ্বল অমর নিদর্শন। শত্রু, মিত্র, শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, পরিচিত, অপরিচিত, জীবিত, মৃত, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, ইহাদের কাহারও পিপাসা শান্তির জন্য, ইহাদের কাহারও পরিতৃপ্তির জন্য, হিন্দু-

সন্তান অবহেলা করেন না। তর্পণের উদ্দেশ্য কি মহান্!! হিন্দুর তর্পণ-ক্রিয়া জগতের এক প্রধান শিক্ষা। এক অঞ্জলি জল দিতে তোমার অর্থ ব্যয় হইল না, তোমার অসুবিধা বা ক্ষতির উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু অন্য-পক্ষে তোমার হৃদয়ের মহত্ব, হৃদয়ের উদার ভাব এবং মানব-জীবনের পবিত্রতা লাভ হইল না কি? এইরূপ ক্রিয়ায় হৃদয় উন্নত হয়, পিতৃভক্তি জন্মে, সমগ্র জগতের সহিত সহানুভূতির উৎপত্তি হয় এবং পুণ্যচেতা হইয়া পরিণামে হিন্দুসন্তানগণ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক অক্ষয় অক্ষয়ানন্দ ভোগ করেন। যিনি সকলের মিত্র এবং সকলের হিতকারী, যিনি পিতার কুলপাবন পুত্র, তিনিই প্রকৃত তর্পণকারী।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বনমধ্যে নিদ্রিতা দময়ন্তীর নিকট নলের বিদায় প্রার্থনা।

হা ভৈমি! রাজার দুহিতা তুমি। জনম
নরপতি কুলে। উচ্চ-চূড় হর্ম্ম্যাবাসে
অবস্থান যার—আজ সেই দীনবেশে
বিচরণ করে বনে কাঙ্গালিনী সম?
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণে না বরিয়া কেন
প্রদানিলে বরমাল্য এই অভাগারে?
অসমিক্ষ্য ফল তাই পাও অনুক্ষণ,
দাও নাহি তবু কিন্তু জানিবারে মোরে।
বিজন বিপিনে—হিংস্রকের ক্রীড়াভূমি—
দীনের সম্বল তোমা দিব বিসর্জ্জন!
চন্দ্রকান্ত মোর—অনন্ত উপায় আমি।
বিনাশিয়া প্রণয়ের পবিত্র বন্ধন—
পৃথক্ হইব আমি জীবনের মত,
সুপ্রসন্ন দেবগণ হ'ন তব প্রতি,
বিধান করুন্ তাঁরা তব শুভ-হিত
সানন্দে বিদায় দাও দময়ন্তী সতী।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রধান।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

(২)

অগ্নিদগ্ধের ঔষধ।—নারিকেল তৈল ও চুনের জল একটি প্রস্তর-পাত্রে উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া পরিষ্কার কাপাসের তুলায় ভিজাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিবে। ঐ তুলা শুষ্ক হইতে দেখিলেই বারংবার উহা দ্বারা ভিজাইয়া দিবে। এইরূপ ২।৩ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেই দগ্ধস্থান আরোগ্য হইবেক।

দগ্ধ হওয়া সময়ে চিটাগুড় লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

গোল আলু উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা সত্বর নিবারণ হয়।

পোড়া ঘৃত দিনে ৪।৫ বার দগ্ধস্থানে লাগাইলে ২।৩ দিন মধ্যে আরোগ্য হয়।

দাস্ত পরিষ্কারক ঔষধ।—জোয়ান ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও আদা ২ তোলা এই তিন দ্রব্য উত্তমরূপে ছেঁচিয়া ।৵॥ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া এক চাম্চ চা তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এক মিনিটকাল ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর কিঞ্চিৎ মিছরী সহযোগে সেবন করিলে ২।১ বার দাস্ত হইয়া অথবা সঞ্চিত মল হজম হইয়া শরীর পাতলা হইবে।

কাঁটানটে ছয় আনা ও আদা ছয় আনা পরিমাণ লইয়া, উভয়ে একত্রে পেষণ করিয়া, ৩টী বড়ি প্রস্তুত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২।১ বার দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হইবে।

অর্দ্ধতোলা পরিমাণ সোণামুখির পাতা অর্দ্ধসের জলে কিছু কিস্মিস্ সহ জাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বার খাইলে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

গরম দুগ্ধ কিস্মিস্ সহ পান করিলেও দাস্ত পরিস্কার হয়।

হরিতকি সৈন্ধব লবণ সহ বাটিয়া খাইলেও দাস্ত পরিষ্কার হয়।

হস্তপদাদি কাটার ঔষধ।—দুর্ব্বা বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইয়া জলপটি বাঁধিলে উপকার হয়।

ইন্দ্রযব গাছ বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে আরোগ্য হয়।

ভোলকলম্বি গাছের ডাটা ছেঁচিয়া কাটাস্থানে জড়াইয়া লাগাইয়া জলপটি বান্ধিলে আরোগ্য হয়।

খয়েরের জলে দূর্ব্বা বাটিয়া সেই দূর্ব্বা কাটাস্থানে লাগাইয়া জলপটি বান্ধিলে শীঘ্র কাটাস্থান আরোগ্য হয়।

বুকে সর্দ্দি বসিলে তাহার ঔষধ।—কণ্টকারী ও মিছরী অৰ্দ্ধসের জলে জাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সকাল ও বিকালে ২।৩ দিন ২ বার করিয়া খাইলে উপকার হয়।

হাড় বাকসের ছাল, পিপুলের ডাটা ও গোল মরিচ জলে জাল দিয়া ২।৩ দিন দুই বেলা খাইলে আরোগ্য হয়।

জল অগ্ন্যুত্তাপে উষ্ণ করিয়া তন্মধ্যে অল্প সৈন্ধব লবণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপর একটি লঙ্কা প্রদীপের আলোতে পোড়াইয়া ঐ উষ্ণ জলে ফেলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া ঐ উষ্ণ জল পান করিলে বুকের সর্দ্দি তরল হইয়া উঠিয়া যাইবে এবং তদ্সংসৃষ্ট গলায় ব্যথা থাকিলে তাহাও আরোগ্য হইবে।

মিছরী, গোলমরিচ অল্প মাত্রায় ও তেজপত্র ২ খণ্ড জল সহ জাল দিয়া শয়নের পূর্ব্বে একবার করিয়া ২।৩ দিন খাইলেই বিশেষ উপকার হয়।

সে মোর কে?

সে মোর কে?—জানি না তো তাহা,
দেখেছি—দিয়েছি প্রাণ তার পদতলে
জনমের মত,
মনে আছে সে মাহেন্দ্র যোগ
যখন এ ক্ষুদ্র বুকে আঁকিয়াছি তার
ভাব ভঙ্গি যত।

(২)

ছেঁড়া তার সহসা আবেগে
বেজে উঠেছিল গুণ গুণ রব তুলি'
হৃদয় ধ্বনিয়া,
গত কত দিন—কত মাস
আজও তাহার সেই মৃদু মধুস্বর
(যায় নাক) দিগন্তে মিশিয়া।

(৩)

শুধু এ ভাঙ্গা ঘরের কোণে
সরবে—নীরবে কভু তার প্রতিধ্বনি
প্রতি পলে উঠে,
সে মোহন মুরতিও তার
এ হৃদি গগনে আছে সেই দিন হ'তে
চাঁদ সম ফুটে।

(৪)

ওগো বাসনা গঠিত নহে
সে চরণ দুই খানি,—প্রতি অণুকণা মাঝে
প্রতিবিম্ব তার,
জন্ম জন্মান্তর তরে
সম্পদে বিপদে সুখে দুখে কভু তাহা
মুছিবে না আর।

(৫)

সেই সে কেমন চোখ দুটি
ঠিক সেই ভাবে এখনো খেলিছে মোর
চোখ দুটি' পরে,
লজ্জা আর কিসে কিসে মিশে
কি যে রূপ দেখেছিনু সে চোখ দুটিতে
আজো মনে পড়ে।

(৬)

সে মোর কে—কেহ না আমার,
প্রাণ আর প্রাণী সনে যে চির বাঁধন
(মোর) তার সনে তাই,
বেশী কিছু সুধায়োনা মোরে
এ সারা জগত জুড়ে খুঁজিয়াছি তার
তুলা মিলে নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

প্রভাতী।

মধুর কিরণ, ভাতিছে কেমন,
স্নিগ্ধ প্রভাত বেলা,
শিশির সিক্ত ফুল্ল কুসুমে
অনিল করিছে খেলা।
শান্ত, শীতল তটিনী বক্ষে
তরঙ্গ বহিছে ধীরে,
গাইছে কোকিলা, প্রভাত সঙ্গীত,
হর্ষে বিটপী শিরে।
প্রণয়-মুগ্ধা স্বর্ণ প্রকৃতি
এলা'য়ে দিয়াছে চুল,
মলয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ শীতলে
হাসিয়া উঠিছে ফুল।
দীর্ঘ যামিনী গিয়াছে চলিয়া,
ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর,
আজি এ প্রভাতে, কল্পনে অয়ি,
কেন লো বিষাদ তোর?
গিয়াছে রে কত ঝঞ্ঝা ভীষণ,
তবুও যায় নি আশা,—
ভুলেছি রে কত স্বপ্ন অতীত,
ভুলিনি সে ভালবাসা।
হেরি প্রকৃতির প্রীতি-অভিনয়,
ভাঙ্গিল স্বপন আজ,
আয় প্রেমময়ি, মত্ত হৃদয়ে,
ভুলিয়া সঙ্কোচ, লাজ!
বাজা রে মুরজ,— ত্রিতন্ত্রী, বীণা;
মধুর সপ্ত-সুরে,
উঠুক সে ধ্বনি, জলধি, বিশ্ব
কাঁপায়ে, সুরগপুরে!

ভাঙ্গুক নিদ্রা, ভাঙ্গুক স্বপ্ন
জাগুক জগদ্বাসী,
এমনি মধুরে অনন্ত বক্ষে
হাসুক কিরণ-রাশি!

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

সোহাগিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্ধু সনে।

মানব-মন রহস্যের ভাণ্ডার। ইহা যে কখন কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা বুঝিয়া উঠে কাহার সাধ্য। যখন মনোরমা রুদ্রপুরে ছিল, যখন উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইত, তখন অনঙ্গমোহনের পীড়ার লেশ মাত্র ছিল না। অনঙ্গ প্রত্যহই মুখুয্যেদের বাটী যাইত, ভবদেব তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। ভবদেবের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার আদরের দুহিতা মনোরমাকে অনঙ্গের ন্যায় সচ্চরিত্র গুণবান পাত্রে অর্পণ করিবেন, কিন্তু মানুষ যাহা মনে ভাবে, ভগবান তাহা করিতে দেন না। তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইতে না হইতেই, দুরন্ত শমন সকল আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া ভবদেবকে অকালে কবলিত করিল। মনোরমা পিতৃহীনা হইয়া মাতুলালয় সন্তোষপুরে নীতা হইলেন। মনোরমার মাতুল তাহাদিগকে নিজগৃহে রাখিয়া কিছুদিন তত্ত্বাবধারণ করত নিজ কর্ম্ম স্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। মনোরমা ও তাঁহার জননী একমাত্র দাসী লইয়া সন্তোষপুরেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনঙ্গ-মনোরমার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়াছে।

যাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসা যায়, তাঁহার বহু দিন অদর্শন-জনিত যাতনা ভোগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অনঙ্গমোহন মনোরমার চিন্তা করিয়াই পীড়িত হইয়াছিলেন, এ বিরহ বিকার কেহ জানিতে পারে নাই; পিতা মাতা মনে করিয়াছিলেন, অনঙ্গ অহোরাত্র পরীক্ষার

পাঠাভ্যাস করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে; তাই এই পীড়ার সূত্রপাত। এখন তাঁহাকে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, তাঁহারা যার-পর-নাই প্রফুল্লিত হইলেন এবং পুত্রের বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

অনঙ্গমোহনের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, অথচ নানা প্রকার পীড়ায় তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল; এই কারণে তিনিও কিছুদিন দেশ ভ্রমণের মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার সহপাঠী বন্ধু নরেন্দ্রনাথকে তাই তিনি সহযাত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বেলা প্রায় সায়াহ্ন হইয়াছে, প্রখর রৌদ্রের তাপ মন্দীভূত হইয়াছে; ফাল্গুন মাসের দিবা অবসান, মন্দ মন্দ মলয় মারুত হিল্লোলে মানব-মন কি এক বিমল সুখ অনুভব করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এ সময় রোগী তাপী সকলেই শান্ত, সকলেই সুস্থ; সকলেই প্রকৃতি দেবীর সুশীতল ক্রোড়ে শান্তিসুখানুভব করিতেছে। অনঙ্গমোহনের প্রকৃতি-সতীর এ হেন মধুর ভাব অনুভব করিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পাদচারণা করিতে করিতে পবিত্রতোয়া জাহ্নবী-কূলে সমাগত হইলেন। এ সময় ভাগীরথী তীরে লোকজনের অভাব নাই; সকলেই শীতল হইবার জন্য শীতলতাময়ীর সুশীতল কূলে আসিয়া দেহ মন পবিত্র করিতেছেন।

বসন্তের প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নদী তীরে পরিভ্রমণ করিলে রুগ্ন শরীর রোগশূন্য হয়—এই জন্য সকলেই দুরন্ত শীত ঋতুর অন্তে বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ অভ্যাস করিত, এক্ষণে আমাদের দেশে ষড়ঋতুর আর তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই,—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতুরই বেশী প্রচলন বলিয়া বোধ হয়, অন্য তিন ঋতুর আবির্ভাব হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ প্রকৃতি বিপর্য্যয় হইত না—সকল ঋতুই সমান ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিত তাই একাল অপেক্ষা সেকালের লোক অধিক সুখী এবং নীরোগী ছিল।

অনঙ্গমোহন পদচারণা করিতে করিতে রুদ্রপুরের স্নানঘাটে আসিয়া সুশীতল সমীর সেবন করিয়া স্নিগ্ধ হইতে লাগিলেন। দেবী ভাগীরথীর লহরী-লীলা সন্দর্শন করিয়া প্রাণে অপার আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। মনুষ্য সংসার-জ্বালায় যতই কেন জ্বালাতন হউক না, পুণ্যসলিলা জাহ্নবী-তটে আসিলে, তথায় উপবেশন করিয়া, সলিলশিকরবাহী মৃদু

মন্দ সমীরণ সেবন করিলে, তাহার প্রাণের জ্বালা কতক পরিমাণে প্রশমিত হইবেই হইবে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। সমাগত মানবকুল একে একে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। অনঙ্গমোহন তখনও স্থিরভাবে ঘাটে বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় একজন যুবক অনঙ্গের পশ্চাৎ দিক হইতে ডাকিল—"অনঙ্গ। তুমি এখনও অপেক্ষা করিতেছ?" অনঙ্গমোহন পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের বন্ধু বাল্যজীবনের সহাধ্যায়ী নরেন্দ্রনাথ। অনঙ্গ নরেন্দ্রনাথকে নিকটে বসাইয়া নানা কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন্দ্র! তমি বাড়ী গিয়াছিলে কি? তথায় কি আমার প্রাণের মনোরমার কোনও সন্ধান পাইয়াছ?" নরেন্দ্রনাথ অনঙ্গের এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া, মনে মনে বলিলেন,—ধন্য অনঙ্গ! ধন্য তোমার ভালবাসা—ধন্য তোমার মনোরমার প্রতি অনুরাগ। তুমি ধনীর একমাত্র পুত্র, ইচ্ছা করিলে কত শত মনোরমাকে তোমার দাসী করিতে পার, কিন্তু তোমার সে ইচ্ছা নাই; তুমি দরিদ্রকন্যা মনোরমাকেই একমাত্র জীবনসঙ্গিনী জানিয়া, আত্ম সমর্পণ করিয়াছ, তাহার জন্য শারিরীক ও মানসিক কত কষ্টই সহ্য করিতেছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনোভাব গোপন করিয়া পরে বলিলেন, "হাঁ ভাই। আমি দেশে গিয়াছিলাম। মনোরমা জননী সহ সন্তোষপুরেই আছে; ভাই! তুমি তাহার জন্য চিন্তা করিয়া আর শরীরকে কষ্ট দিও না, মনোরমা ত তোমায় ভুলে নাই। তোমার পিতাও মধ্যে মধ্যে তাহাদের সংবাদ লইয়া থাকেন। বোধ হয় অশৌচান্তে তোমার পিতা তাহার সহিত তোমার উদ্বাহক্রিয়া সমাধা করিবেন। তুমি যাহা মনে ভাবিয়াছ, তাহা ভ্রম, তোমার পিতা অন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করেন নাই।"

ভালবাসা একবার যেখানে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা অতীব দুরূহ কার্য্য। অনঙ্গমোহন মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় পিতা এক্ষণে মনোরমার সহিত তাহার বিবাহ দিতে রাজি নহেন, অন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছেন। এইজন্য অনঙ্গ নরেন্দ্রনাথকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতার সম্মুখে পুত্র এখনকার মত বাচালতা প্রকাশ করিত না, সেই জন্য অনঙ্গ গোপনে বন্ধুর দ্বারা সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া

গৃহাভিমুখে যাইবার সময় নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর দেখিতেছি বড়ই খারাপ হইয়াছে, কবিরাজ মহাশয় যে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?" অনঙ্গ বলিলেন, "দুই চারি দিনের মধ্যেই যাইব, পিতা তোমাকে সঙ্গে পাঠাইবেন, বলিয়াছেন, আমরা একত্রেই যাইব।" এই বলিয়া উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদেশ যাত্রা।

অনঙ্গমোহনের বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার দিন স্থির হইয়াছে। আগামী কল্য প্রাতঃকালে তিনি শুভযাত্রা করিবেন। নানাবিধ আয়োজন হইতে লাগিল। হরসুন্দর বাবুর অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ একত্রে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হরসুন্দর বাবুর অর্থের অভাব ছিল না, তিনি একমাত্র পুত্র অনঙ্গমোহনের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বৃদ্ধ নিজেই সঙ্গে যাইতেন, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে, অনঙ্গমোহন তাঁহাকে স্বদেশ ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, পিতঃ। এ সময় আমরা উভয়েই গৃহ ছাড়িয়া যাইলে জমীদারীর টাকা কড়ি আদায়ের বড় গোলমাল হইবে। আমরা শীঘ্র ফিরিয়া আসিব—তাহার জন্য আপনার কিছুমাত্র চিন্তা করিবার কারণ নাই।" অনঙ্গমোহন তাঁহার পিতা মাতাকে এই প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারাও জানিতেন, অনঙ্গ বুদ্ধিমান এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের পুরাতন গোমস্তা রূপ-নারায়ণ রায় সঙ্গে যাইবেন, এরূপ স্থলে পিতামাতার চিন্তার কোন কারণ নাই। অনঙ্গমোহনও নিতান্ত বালক নহেন, তিনিও যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শাস্ত্র পাঠে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়াছে। অনঙ্গমোহন তাঁহার পিতার ন্যায় অমায়িকপ্রকৃতিসম্পন্ন, পিতার যাবতীয় গুণ পুত্রে ন্যস্ত হইয়াছে, এ হেন পুত্রের প্রতি পিতামাতার সন্দেহ সম্ভবপর নহে।

অনঙ্গের কলেজ বন্ধ হইয়াছে; তাহাতে আবার তিনি এ বৎসর বি, এ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহার ফলাফল না জানিতে পারিলে, আর পাঠের সুবিধা হইবে না। এই নিমিত্ত এই অবসরে তিনি বন্ধুগণসহ একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। এ ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন হইতেই প্রবল ছিল। তাহার পর কবিরাজ মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার পিতামাতার অনুমতি পাইয়াছেন। দেশভ্রমণে মনে প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এখনও ভারতে হিন্দুর অদ্ভূত কীর্ত্তিকলাপ যাহা দেখিবার আছে, বোধ হয় তাহা আর কোন জাতির নাই। এ সকল দেখিতে, দেখিয়া হৃদয় মন পবিত্র করিতে, কাহার না ইচ্ছা হয়? অনঙ্গমোহন বাল্যকাল হইতে দেশভ্রমণে বড়ই প্রিয়; এই সুযোগ কি তিনি ছাড়িতে পারেন?

অনঙ্গ মোহন আনন্দ অন্তঃকরণে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগত, অনঙ্গমোহন বন্ধু নরেন্দ্রনাথকে নিকটে রাখিয়া সেদিনকার শর্ব্বরী যাপন করিলেন। অঙ্গীকার মত পরদিবস নরেন্দ্রনাথ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন, গোমস্তা রূপ নারায়ণ বাবুও সজ্জিত হইলেন।

পুত্রকে কাছ ছাড়া করিতে জননীর যত কষ্ট, এত কষ্ট আর কাহারও হয় না, লীলাবতী পুত্রের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি একত্রিত করিতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব দিন পুত্রের হিতার্থে অনাহারে ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার যেন কোনও কষ্ট হয় নাই, আজ আবার অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লীলাবতীর দাস দাসী সকলই আছে, তথাপি তিনি আবশ্যকীয় কার্য্য সকল স্বহস্তে করিতেন। দাস দাসীর উপর এ সকল ভার দিয়া তাঁহার মনঃপুত হত না। তিনি প্রাতঃকালে পুত্রকে আহারাদি করাইয়া গৃহদেবতা নারায়ণের অর্ঘ্য আনয়ন করতঃ যাত্রাকালে পুত্রের মস্তকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, সদা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে, যাঁহারা সঙ্গে যাইতেছেন, কখন তাঁহাদের কাছ ছাড়া হইবে না, শরীর সবল হইলে যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আসিবে। মনিহারা হইয়া ফণিনী যেমন ম্রিয়মানভাবে কালযাপন করে, তোমাকে প্রাণ পরিবর্ত্তনে পাঠাইয়া আমিও সেইরূপভাবে রহিলাম। যখন যেখানে

থাকিবে সেইখান হইতে রীতিমত পত্রাদি প্রদান করিবে, তোমার দুঃখিনী জননীর এ কথা কদাচ বিস্মৃত হইও না। আর একটী কথা, ধর্ম্ম ছাড়া মানুষ একদণ্ড বাঁচিতে পারে না—যখন কোনরূপ কষ্ট হইবে, তখন ভগবানের নাম স্মরণ করিও, তাহা হইলে কোনও আপদ বিপদই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।” অনঙ্গমোহন জননীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শুভ যাত্রা করিলেন, বৃদ্ধ হরসুন্দর বাবু প্রাতঃকালেই পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন, তিনিও প্রাণপুত্রের সহিত কৃষ্ণপুরের স্নানঘাট অবধি গমন করিলেন। তাঁহারও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখনও সমস্ত প্রজার নিকট টাকা আদায় হয় নাই, এইজন্য গোমস্তা মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, “বাবু! কোনও চিন্তা নাই; যখন আমি, নরেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ অনঙ্গের সহিত গমন করিতেছি, তখন আপনি নির্ভাবনায় অবস্থান করুন।’ গোবিন্দ তাঁহাদের বাটীর পুরাতন ভৃত্য, সে অনঙ্গের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিল, আরও দুই জন লোক সঙ্গে যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহার সন্দেহের কোনও কারণ নাই। সকলে স্নানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনঙ্গ নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া বজ্‌রা আরোহণ করিলেন। মাঝিরা বজ্‌রা খুলিয়া দিল, যতদূর দেখা গেল, বৃদ্ধ নির্নিমেষনয়নে বজ্‌রা দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ বজরা চক্ষুর অন্তরাল হইলে হরসুন্দর ভগবানের পাদপদ্মে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনোরমার অবস্থা।

রমণী-হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, তাহাতে যাহা অঙ্কিত করিবে, তাহাই অঙ্কিত হইবে, বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে যে স্মৃতি,—যাহার পবিত্র মুরতি একবার অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হৃদয় হইতে অপসারিত করা সুকঠিন। মনোরমা বাল্যকাল হইতেই অনঙ্গকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসি-

তেছে; বাল্যকাল হইতে সে তাহার নিকট পাঠাভ্যাস করিয়াছে। তাহার পিতা তাহার বাল্যকাল হইতেই বলিয়াছিলেন, যদি জামাতা করিতে হয়, তাহা হইলে অনঙ্গের ন্যায় গুণবান ও চরিত্রবান পাত্রকেই জামাতা করিব। এবং অনঙ্গের পিতামাতাও মনোরমার ন্যায় লক্ষ্মী স্বরূপিনী পাত্রীকে বধূরূপে গৃহে আনয়ন করিব মনে করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এইজন্য প্রতিবাসী সকলেই জানিত, অনঙ্গ মনোরমার বর, মনোরমা অনঙ্গের কনে। নানা প্রকার বিঘ্ন বাধায় কেবল একার্য্য এতদিন সমাধা হয় নাই, কিন্তু মনোরমা এখন আর বালিকা নহেন, তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছেন। মনোরমার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর। হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মনোরমার বিবাহের বয়স অতীত হইয়াছে। ভবদেব বাবু জীবিত থাকিলে বোধ হয়, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না।

মনোরমা রুদ্রপুর হইতে আসিয়া অবধি যেন কি এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। নব-প্রস্ফুটিত কুসুমে কীট প্রবেশ করিলে কুসুমের যে দশা হয়, মনোরমা কুসুমে চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে; একে স্নেহময় পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক, তাহার উপর প্রিয় বিচ্ছেদজনিত মনঃকষ্টে মনোরমা ক্রমশঃ যার-পর-নাই মলিনা হইয়া গিয়াছে। সেই আদরে পালিতা স্বর্ণলতিকাটী এই সামান্য দিনের মধ্যেই নানা প্রকার কষ্টে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার সে লাবণ্য জ্যোতি আর নাই। পাংশু আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে জ্যোতি যেন ক্রমশঃ ম্লান হইতেছে। মনোরমাকে এখন যাবতীয় গৃহকার্য্য করিতে হয়। শোকাতুরা জননীকে এখন আর মনোরমা বেশী পরিশ্রম করিতে দেন না। তাহার পিতা উপার্জ্জন করিতেন বটে কিন্তু তিনি শেষ অবস্থায় তাহাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাই তাহাদিগকে এখন মাতুলের অধীন হইয়া কালাতিপাত করিতে হইতেছে। এ কষ্টও মনোরমার পক্ষে অসহ্য হইত না, যদি সে দিনান্তেও একবার অনঙ্গের সাক্ষাৎ পাইত। পাঠক! আপনারা অনঙ্গের অবস্থাও দেখিয়াছেন, এক্ষণে মনোরমার অবস্থা একবার দর্শন করুন। আহা! মনোরমার আর সে রূপ নাই; মধুর অধরে সে হাসি নাই; দুরন্ত চিন্তারাহুতে যেন তাহার মুখচন্দ্রিমার শোভা হরণ করিয়াছে। হাসির পরিবর্ত্তে এখন তাহাতে

দুর্ব্বিষহ চিন্তার যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশমান হইয়াছে। মনোরমার জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে হৃদয়ের আরাধ্য ধন বলিয়া জানিয়াছেন, এখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিবেন, কেমন করিয়া সেই মোহন মূরতি হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন; কোমল স্বভাবা রমণীরত্ন তাহা কদাচ পারে না, এইজন্য মনোরমার এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা।

এক্ষণে মনোরমার যাবতীয় ভার তাঁহার মাতুল মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মাতুলের তাদৃশ সচ্ছল অবস্থা নহে যে, তাহাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করেন। মনোরমার মাতুল ভবতারণ বাবু এলাহাবাদে পুলিশ অফিসে ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সংসারে স্ত্রী, দুই পুত্র, ও এক কন্যা। কন্যাটীকে পাত্রস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কন্যার প্রতিপালনের ভার তাঁহাকে এখন বহন করিতে হইতেছে। তাহার জামাতা বর্ত্তমান আছেন, সংসারে তাহার তাদৃশ আস্থা নাই, তিনি এক প্রকার উদাসীনভাবাপন্ন, তীর্থে ভ্রমণ এবং তথায় সাধকগণের সহিত একত্র বাস করিয়া এই দুর্লভ মানবজীবনের অবসান করিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা; এইজন্য তিনি স্ত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না। ভবতারণ বাবুর কন্যা যামিনী তাই পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই ত তাঁহার সংসারের খরচ, তাহার উপর লীলাবতী ও মনোরমাকে প্রতিপালন করিতে হয়; কাজেই তিনি এখনও মনোরমার বিবাহের কোন সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই এবং রুদ্রপুরে হরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত যে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকী হইয়াছে, তাহাও তিনি জানিতেন; কিন্তু অর্থাভাবে হইয়া উঠিতেছে না, কি করিবেন।

হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার চির প্রসিদ্ধ, একজন মাত্র উপায়ক্ষম হইলেও তাহাকে অনেকগুলি পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়; অন্যান্য জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই, তাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে, হিন্দু তাহা করে না বলিয়া তাহাদের এত অর্থকৃচ্ছ্রতা ও এত কষ্ট। এ প্রথা যতই কেন মন্দ হউক না, হিন্দুর চক্ষে ইহা অতীব পবিত্র এবং অবশ্য প্রতিপালনীয়; আপনি স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে থাকিব, আর পিতামাতা প্রভৃতি অক্ষম আত্মীয় স্বজন অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে, আমাদের নিকট এ প্রথা

ভাল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, মনোরমার মাতুল মাসিক সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিলেও হিন্দুর চির প্রথানুসারে অনেকগুলি পোষ্যকে অন্ন প্রদান করিতেন এবং এই জন্য তাঁহার অর্থের এত অনাটন কিন্তু তাহাতেও তিনি তিলমাত্র দুঃখ অনুভব করিতেন না বরং যাহাতে তিনি অধীনস্থ জনগণকে সুখে রাখিতে পারেন, তাহার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভবতারিণীও সকল অংশে স্বামীর অনুরূপা ছিলেন, তিনি কখনও এই বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত মনোবিবাদ করিতেন না। উচ্চবংশের কন্যা বলিয়া তিনিও এ সকল বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। ভবতারণ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মনোরমাকে কন্যা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। এক্ষণে তাহার বিবাহ চিন্তাই স্বামী-স্ত্রীর একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছে। লীলাবতী এক্ষণে ভ্রাতার উপর প্রাণের একমাত্র দুহিতা মনোরমাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পতিগতপ্রাণা লীলাবতী পতিবিয়োগের পর হইতে জগৎসংসার যেন অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহার সংসারের সকল সুখ ফুরাইয়াছে, কেবল নিরাশ্রয়া সুবর্ণ-লতিকা মনোরমাকে সহকারের আশ্রয়ীভূত করিতে পারিলেই, তিনি ধীরে ধীরে সংসার হইতে অপসৃত হইতে পারেন। [ক্রমশঃ]

সম্পাদক।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি।

(গল্প)

বাল্যকালেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় আমার মাতুল আমার পড়াশুনার ভার লইলেন। তিনি পাটনায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী করিতেন। আমি সেইখানে তাঁহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতাম। যেথানে আমাদের বাসা ছিল, সেথান হইতে কিরণবালার বাড়ী অতি নিকটে। কিরণ আমার খেলার সাথী ছিল। স্কুলের ছুটীর পর আমি, কিরণ ও অন্যান্য বালকগণ মিলিয়া খেলা করিতাম। খেলা সাঙ্গ হইয়া গেলে, আমি আমার বাসায় ফিরিয়া আসিতাম, কিরণ ও অন্যান্য সকলে আপনাপন বাড়ী চলিয়া যাইত।

কিরণের আপন মা ছিল না; বিমাতা ছিলেন। তিনি তাহাকে বড় একটা দেখিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময় কাজকর্ম্মের ফরমাইস্ করিতেন। কিরণ অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু ছিল। সে বিমাতাকে কোন কথা না বলিয়া নীরবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত। এ ছাড়া বৈমাত্রেয় ছোট ছোট ভাই-ভগ্নীদের পা ধোয়ান, জুতা পরান, কোলে ক’রে নিয়ে বেড়ান তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিরণের পিতা কিরণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যে সময় যে জিনিষটী পাইতেন, তাহা আনিয়া কিরণকে দিতেন। কিন্তু কিরণের বিমাতা সে বিষয় কোন প্রকারে জানিতে পারিলে তাঁহার বাক্যবাণে কিরণকে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জিনিষটী বৈমাত্রেয় ভাই-ভগ্নীদের প্রত্যর্পণ করিতে হইত।

কেশের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য কিরণের পিতা একবার কলিকাতা হইতে ৪ শিশি ভাল তৈল আনিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। একথা কিরণের বিমাতা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সেবার তিনি তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। কারণ কিরণের পিতা তাহার বিমাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"দেখ, তুমি কিরণের নিকট হ'তে যেই ৪ শিশি তৈল লইও না। ইহা মাখিলে চুল বেশ পরিষ্কার হয় এবং

[illegible] সুন্দর হয়। আমি বড় গরীব লোক। কিরণের বিবাহ [illegible] হইলে বরের পিতাকে বেশী কিছু দিতে পারিব না, তাহার উপর যদি কিরণ দেখ্‌তে ভাল না হয়, তবে লোকে কিরণকে বউ ক'রতে ইচ্ছা ক'র্‌বে কেন? আর তা' না হইয়া যদি আমাকে ঋণের দায়ে জেল খাটাতে ইচ্ছা কর, কিরণের নিকট হ'তে তেলের শিশিগুলি কেড়ে নিতে পার।" কিরণের পিতার এই কথাতেই তাহার বিমাতা তাহার নিকট হইতে তৈলের শিশি লইতে ক্ষান্ত ছিলেন।

আর একবার কিরণের পিতা কলিকাতা হইতে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর ছবি আনাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিনি কিরণকে দুইখানি ছবি দিলেন; অন্যান্যগুলি তাহার ছোট ভাই-ভগ্নীদের দিলেন। যথাসময়ে কিরণের বিমাতার জানিতে আর বাকী রহিল না। যেখানে বসিয়া কিরণ ছবি দুই খানি দেখিতেছিল, তিনি ক্রোধান্ধ ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ছবি নিয়ে বেশ খেলা হ'চ্ছে যে? আজ ছবি পেয়েছ ব'লে কি আর কোন কাজকর্ম্ম করতে নেই? মরণ আর কি!—বুড়ি হ'য়ে মর্‌তে গেলেন, তবু ছবি নিয়ে খেলা। কোথাও কিছু পেলে আগে ছোট ভাই বোন্‌দের এনে দেবে, তা না হ'য়ে বুড়ির সখ দেখ!" কিরণ কোনও কথা বলিল না। ধীরে ধীরে বিমাতার হস্তে ছবি দুইখানি ফিরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া দুইটী মুক্তা নীরবে গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর সেই ছোট ভাইবোনেরা যেখানে খেলা করিতেছিল, সেইখানে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিরণের পিতা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়া তাহা জানিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি জানিয়াই বা কি করিবেন? মুখরা গৃহিণীর উপর কোন কথা বলিতে যাওয়া অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হইলে ত আর কোন কথাই নাই! কাজেই তিনি বাধ্য হইয়াই নিরবে রহিলেন। কিন্তু কিরণের দুঃখ দেখিলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। এমন কি, তিনি তাহার জন্য নির্জ্জনে কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিরণকে দেখিলে পরলোকগতা বিষাদ প্রতিমার প্রেমময় মুখখানি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পূর্ব্বকালীন তাহার সেই প্রেমাশ্রুবিজড়িত কাতরোক্তি—"আমি ত চলিলাম। আমার অভিমানী কিরণবালা রহিল।"—আসিয়া হৃদয়কে

উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। সেই কারণেই কিরণের প্রতি স্নেহ তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু গৃহিণীর প্রতাপে তিনি অনন্যোপায় ছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় কিরণ, আমি, যোগেন ইত্যাদি বালকবালিকাগণ মিলিয়া খেলা করিতেছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ আমার ধাক্কা খাইয়া যোগেন পড়িয়া গেল। সেখানে একটী পাথর ছিল। যোগেন তাহারই উপর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। সেইদিন আমাদের খেলার শেষদিন। মামা তাহা জানিতে পারিয়া আমার খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ আমার দেখাদেখি কিরণও সেইদিন হইতে খেলা বন্ধ করিয়া দিল।

স্কুলের ছুটীর পর বাসায় আসিয়া আমি বরাবর খেলা করিতাম, কিন্তু ইহার পর হইতে আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল,—চুপ করিয়া থাকিতে পারিতাম না। হয় এটা, না হয় ওটা করিয়া মামার যত জিনিষ-পত্র কেতাবাদি ছিল তাহাই ঘাঁটিতাম। একদিন হঠাৎ হাত লাগিয়া একটী ভাল কেতাবের উপর দোয়াত উল্টাইয়া পড়িল। তাহা লুকাইবার কত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই সফলমনোরথ হইলাম না। মিথ্যা কথা কয়দিন গোপনে থাকে? মামা ক্রমে জানিতে পারিলেন। আমি কত তিরস্কৃত হইলাম। সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণান্তে আর কখনও মামার জিনিষে হাত দিব না। কাজে কর্ম্মেও তাহাই হইল। পরদিন স্কুলের ছুটীর পর বাসায় আসিয়া বই দপ্তরাদি যথাস্থানে রাখিয়া একবারে কিরণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। কারণ মামা স্বভাবতঃ অত্যন্ত রাগী ছিলেন—আর সব সময় দৌরাত্ম্য করা আমার স্বভাব ছিল। কাজেই বাসায় থাকিলে স্বভাব বশতঃ হয় ত আবার কোন অনিষ্ট কার্য্য করিয়া ফেলিব। প্রথম দৌরাত্ম্যের দিনে মামা আমায় অধিক কিছু বলেন নাই। কিন্তু এইবার দোষ দেখিলে আর রক্ষা রাখিবেন না। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কিরণের বাড়ীতে আসিলাম।

কিরণ তখন তাহার একটী ছোট ভাইকে কাপড় পরাইতে ব্যস্ত ছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া যে ঘরে সে থাকিত, সেই ঘরের দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কিরণ আগে আগে চলিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

যখন আমরা নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন কিরণ আমাকে সেই ঘরের পর্য্যঙ্কের উপর বসিতে বলিয়া পুনর্ব্বার প্রকোষ্ঠের বাহিরে গেল। আমার কাছে তাহার ছোট ভাইটী থাকিল। আমি পূর্ব্বে আর কখনও সে ঘরটী দেখি নাই। আজ তাহাদের বাড়ীর সাজ-সরঞ্জমগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দেখিলাম, কোথাও wall shelfএর ভিতর রাশি রাশি পুস্তক রহিয়াছে—কোথাও দেওয়ালের গায়ে নানাপ্রকার ছবি ঝুলিতেছে—কোথাও একটী অলমারীর ভিতর বেশ সুন্দর সুন্দর পুতুল, ফুলদানী ইত্যাদি কত কি রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে, সেগুলির কাছে গিয়া এক একটী হাতে লইয়া দেখি, কিন্তু তখন সেখানে কিরণ ছিল না বলিয়া সাহসে কুলাইতে ছিল না। তথাপি সেগুলি যাহাতে একবার নিজ হস্তে করিয়া দেখিতে পারি, তাহার জন্য মনে মনে কত ফন্দী ফিকির আঁটিতে লাগিলাম। কাচের বালকটীও অনেকক্ষণ সঙ্গীহারা হইয়া সেই অবকাশে কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় কিরণ থর-কম্পিতহস্তে এক গ্লাস জল ও সন্দেশ মিঠাই পরিপূর্ণ একটি রেকাব আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি হ'বে কিরণ?" প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "তুমি খাবে ব'লে এনেছি।" আবার আমি বলিলাম, "আমার জন্য আজ এত আয়োজন কেন কিরণ?" এবার সে কোন উত্তর দিল না। দেখিলাম, তাহার গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইয়া আসিয়াছে। কি বলিয়া সে উত্তর দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না। তখন আমি বলিলাম, "তাহ'লে কিরণ তুমিও খাবে এস।" কিরণ আমার কথা ঠেলিতে পারিল না। সে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত খাইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে তাহার ভাইটীকে খাওয়াইতে লাগিল।

সেদিবস কিরণ যে আমার প্রতি কিরূপ উচ্চদরের ভালবাসা দেখাইয়াছিল, আমি তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তখন যদি তাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমায় এরূপ অশান্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া জীবনযাপন করিতে হইত না।

যাহা হউক, কিরণ আমাকে যতই খাওয়াক না কেন, তখনও পর্য্যন্ত গৃহের যাবতীয় বস্তুগুলি দেখিবার আশা আমার হৃদয়ে বলবতী ছিল। খাওয়া শেষ হইলে আমি কিরণকে আমার ইচ্ছা জানাইলাম। কিরণ তখন এক একটী করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র আমাকে দেখাইতে লাগিল। আমার

কন্তু তাহাতে পছন্দ হইল না। আমি নিজেই সেগুলি হস্তে করিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম। কিরণ তখন একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে আলমারীর জিনিষগুলি দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। ফুলদানী আলমারীর অনেক উচ্চে ছিল বলিয়া আমি একটী চেয়ারের উপর আর একটী চেয়ার রাখিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর যেমন ফুলদানী হাতে করিয়া নামিব মনে করিয়াছি, অমনি চেয়ার সমেত উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। দৈবক্রমে আমার শরীরে বেশী আঘাত লাগিল না, কিন্তু হস্তস্থিত ফুলদানিটী ভাঙ্গিয়া গেল। কিরণ সেই ফুলদানী ভাঙ্গার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি পড়িয়া যাওয়ায় কোথাও আঘাত লাগিল কি না, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "না—কিছুই লাগে নাই।"

চেয়ার সমেত আমি পড়িয়া যাওয়ায় ঘরের ভিতর একটা ভয়ানক শব্দ হইল। কিরণের বিমাতা সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিরণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন। আমি চুপ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া কেবল কিরণের ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আর কিছুই হইল না, সন্ধ্যা হইলে আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। মনে বড় ভয় হইল, পাছে মামা এই সব কথা জানিতে পারেন। কেন না, তাহা হইলে বোধ হয়, সন্ধ্যার সময় পিঠের উপর যষ্টি বর্ষণ হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মামা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

পরদিবস কিরণদের বাড়ীর একজন চাকরাণীর মুখে শুনিতে পাইলাম যে, ফুলদানী ভাঙ্গিবার দরুণ কিরণের বিমাতা তাহাকে কত বকিয়াছেন—কত চুল ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন। কিরণ কিন্তু সে সকল অনায়াসে সহ্য করিয়াছে। তথাপি কাহাকেও উহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে দেয় নাই। কেবল নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া সকল কষ্ট দূর করিয়াছে।

কিরণের বাড়ীর নিকট দিয়া আমার স্কুল যাইবার পথ। সেদিন স্কুল যাইবার সময় কিরণের সহিত দেখা হইল; কিন্তু কিরণ তাহার বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারের কোন কথা আমাকে বলিল না। আমার প্রতি কিরণের যেরূপ ভালবাসা ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ দেখিলাম।

ইহার পর তবুও আমি কিরণের বাড়ী যাইতাম। বস্তুতঃ কিরণ তাহাতে

রাগ প্রকাশ করা দূরের কথা বরং আনন্দিত হইত। আমি কিন্তু তাহার এই বাক্যহীন আন্তরিক ভালবাসার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতাম না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় ছিলাম,—আমার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। আমি তখন উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। কিরণের পিতার অনেক পুস্তক ছিল বলিয়া আমি প্রায়ই সেইখানে গিয়া উপন্যাস পড়িয়া আসিতাম। একদিন আমি ও কিরণ দুজনে তাহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া একখানি নভেল পড়িতেছিলাম। হঠাৎ সেই গৃহস্থিত একটী নবক্রীত ঝাড়ের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। আর আমার বই পড়া হইল না। সেটী কিরূপ দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম। কিরণও আমার পথানুবর্ত্তিনী হইল। আমি ক্রমে সেই ঝাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিরণ তখন তাড়াতাড়ি গিয়া সেই ঝাড় হইতে একটা কলম খুলিয়া আনিল। তার পর উহার ভিতর নানা রকম রং দেখাইল। তাহা দেখিয়া আমি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না। বড় ইচ্ছা হইল, উহার একটা লই। কিরণ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "তুমি একটা নেবে? তা এইটে নাও।" আমার কিন্তু তাহাতে মন সরিল না। আমি নিজে একটী ভাল দেখিয়া বাছিয়া লইবার জন্য ঝাড়ের নিকটে গেলাম। পূর্ব্বে ঝাড় দেখিয়াছি, কিন্তু উহার কলম কিরূপে খুলিতে হয়, তাহা জানিতাম না। কাজেই একটী কলম পাইবার প্রত্যাশায় ঝাড়ের একটী ডাণ্ডা ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিলাম। কিরণ তাহা দেখিতে লাগিল কিন্তু সে আমাকে একটী কথাও বলিল না। সে ভাবিয়াছিল যে, আমাকে সেরূপ করিতে নিবারণ করিয়া অনর্থক আমার মনে কষ্ট দিবে না। কিন্তু তাহাতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা যদি সে জানিত, তাহা হইলে সে কখনই নিবারণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। কাচের জিনিষ এত টানাটানিতে কতক্ষণ টিকিবে? শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গিয়া আমার কপালের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ণধারে আমার কপাল কাটিয়া গেল। অবিশ্রান্ত ধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল। ক্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিল। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। কিরণ আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল। আমি শুইয়া পড়িলাম। তারপর আমার কি হইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

এইরূপে তিনদিন তিনরাত্রি অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। চতুর্থ দিবসে আমার একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, কিরণ আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে। তখন সন্ধ্যার অধিক বিলম্ব নাই। আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেই ঘরের রুদ্ধ-বাতায়নের উন্মুক্ত পথ দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভকিরণ অশ্রু-প্লাবিতা কিরণের গণ্ডস্থলে প্রতিভাত হইয়া একটী মধুর দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে দৃশ্য কি কমনীয়! কি সম্মোহন। আমি যখন সেদিকে চাহিলাম, তখন বোধ হইল, যেন আমি স্বপ্নরাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু চকিতে সে ভাব বিদূরিত হইয়া গেল। তখন দেখিলাম, সূর্য্যের সেই সুবর্ণকিরণ অপসারিত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র কিরণবালা আমার পার্শ্বে বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতেছে। তখন আমার প্রাণ কেমন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কথা কহিতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। শেষে কিরণের গায়ে হাত দিয়া তৃষ্ণার কথা সঙ্কেতে জানাইলাম।

আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া, কিরণের মনে যে তখন কত আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র লেখনীর ক্ষমতা-বহির্ভূত। সে আমার অলক্ষিতে চোখের জল মুছিয়া প্রথমে এক দাগ ঔষধ আমার মুখে ঢালিয়া দিল। আমি যেন প্রাণ পাইলাম। তার পর সে আমার ক্ষতস্থানে প্রলেপ বসাইয়া দিল। তখন আমি ধীরে ধীরে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরণ! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?" কিরণ বলিল, "ডাক্তার তোমায় কথা কহিতে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন। তুমি একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক।" এই বলিয়া সে অন্যদিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু হইতে আবার অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তখন আমি আর তাহাকে কিছু বলিলাম না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিরণ আমার শয্যাপার্শ্বে একটী দীপ জ্বালিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে কিরণের পিতা ও আমার মামা ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া প্রথমে আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন। তার পর কিরণ বলিল, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিল।" তাহা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,

"তা হ'লে ত কোন ভয়ই নাই। কিন্তু সাবধান, বেশী কথা ব'লতে দিও না।" এই বলিয়া তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন। আমি যদিও তখন জাগ্রত ছিলাম, তথাপি কথা বলিতে আমার সাহস হইল না। সকলেই জানিত যে, আমি নিদ্রিত রহিয়াছি।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। তখন পর্য্যন্ত কিরণ আমার শয্যাপার্শ্বে পূর্ব্বের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। একজন চাকরাণী আসিয়া তাহাকে ভাত খাওয়ার কথা জানাইল। কিরণ বলিল, "তুমি মাকে বল গিয়ে, তার পেট ভার আছে। আজ রাত্রে সে আর কিছু খাবে না।" চাকরাণী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। আমি ও কিরণ দুইজন সেই ঘরের ভিতর রহিলাম। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আলো জ্বলিল। নানারূপ দুর্ভাবনায় আমার আর চোখে ঘুম আসিল না। কিরণ আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কখনও ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া—কখনও পাখার বাতাস দিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। আমি সবই দেখিলাম। তথাপি একটীও কথা বলিলাম না। কেন না, তখনও পর্য্যন্ত ডাক্তারের কথা আমার মনে ছিল।

এইরূপে প্রায় এক মাস ধরিয়া কিরণ আমার সেবা শুশ্রূষা করিবার পর আমার কপালের ক্ষতটা ভাল হইল। তখন আমি শরীরে কিছু বল প্রাপ্ত হইলাম। আজ একটু, কাল একটু করিয়া ক্রমে আমাদের বাসা পর্য্যন্ত হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। তার পর একদিন আমি কিরণের পিতাকে বলিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

এতদিন কিরণের বাড়ীতে ছিলাম, হঠাৎ সেখান হইতে চলিয়া আসায় কিরণের মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ীতে তাহার মন টিকিত না। গোপনে গোপনে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া আমাদের বাসায় আসিত।

ইহার পর আবার ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল। আমি তখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। একদিন পূর্ণিমা রজনীতে আমি ও কিরণ দুজনে জাহ্নবী-তটে বসিয়া কত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছি। পাষাণনন্দিনী শত শত পূর্ণচন্দ্র বক্ষে লইয়া তর তর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। শশীকরে ম্লান নক্ষত্রবালারা সুদূর নীলিমা হইতে জাহ্নবী-বক্ষে আপনাদের মুখচ্ছবি দেখিতেছিল। আমি অনেক কথার পর কিরণকে বলিলাম, "কিরণ! আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি তাহার উত্তর দিবে?" কিরণ বলিল, "এমন কি কথা যে তাহার উত্তর দিব না?" আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "কিরণ।

তুমি কি আমায় ভালবাস?" "কিরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "কিরণ! উত্তর দিচ্ছ না কেন?" তখন সে বলিল, "বাসি এই কি! যথার্থই ভালবাসি!! প্রাণের সহিত ভালবাসি!!!" আহা! সে কি মধুর স্বর। সে স্বর যেন আমার কর্ণে সপ্তস্বরা বীণার ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হইল। নৈশবায়ু সেই স্বর লইয়া দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "প্রাণের সহিত ভালবাসি।" তারপর সুদূর নীলিমা ভেদ করিয়া উৰ্দ্ধে—অতি উৰ্দ্ধে গিয়া মিশাইয়া গেল।

আমি আবার বলিলাম, "আচ্ছা কিরণ! আমাদের এই ভালবাসা দৃঢ় করিবার উপায় কি আছে বল দেখি?" এবার কিরণ কোন উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে আমার হাত দুটী লইয়া নিজের মুখে চাপা দিল। আমি তাহার সহিত কথা বলিতে কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু লজ্জায় সে আমার সহিত আর কোন কথা বলিল না। তার পর আমরা দুজনে সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

এই ঘটনার পর প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। তখন কিরণ চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া। বিবাহ বাজারে বর-মূল্য উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে উঠিয়াছে দেখিয়া, কিরণের পিতা এখনও কিরণের বিবাহ দিতে পারেন নাই। আমি দেখিলাম, এতদিন পরে আমাদের উভয়ের জীবনের মধ্যে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমার সহিত তাহার বড় একটা আর দেখা সাক্ষাৎ হইত না। তবে কি কারণে সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিত না তাহা জানিতাম না। হয় ত তাহার পিতা তাহাকে ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন? কিন্তু যাহাই হউক, সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিত না বলিয়া আমিও ইচ্ছা করিয়া আর তাহার সহিত দেখা করিতাম না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিরণের বাড়ীর নিকট দিয়া আমার স্কুল যাইবার পথ। প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় দেখিতাম, কিরণ যেন আমাকে দেখিবার প্রতীক্ষায় বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইলেই আমি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতাম। যে কিরণের সহিত পূর্ব্বে আমার প্রাণে প্রাণে ভাব ছিল, আজ সেই কিরণ আমার সহিত কথা না বলায় স্থিরসিদ্ধান্ত করিলাম যে, নিশ্চয়ই সে আমায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, জীবনে আর কখনও কিরণের সহিত কথা কহিব না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিরণ তাহার জীবনে একদিনের

জন্যও আমাকে অন্যরূপ ভাবে নাই। কেবল তাহা আমার বুঝিবার ভুল।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কিরণ পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া, কিরণের পিতা কিরণের বিবাহের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। কন্যাকে আর অনূঢ়াবস্থায় রাখিতে পারেন না। চারিদিকেই সৎপাত্রের অন্বেষণ লইতে লাগিলেন।

একদিন আমি বাসায় ছিলাম না। সে দিন কিরণের পিতা ও আমার মামা দুইজনে আমাদের বাসায় বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন। দৈব ক্রমে আমি তখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের পরামর্শ যেন কিছু ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি তখন গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে পরামর্শ অন্য কিছুই নহে; তাহা "কিরণের সহিত আমার বিবাহ।" যে আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তাহার সহিত বিবাহ!—যে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, সে আমার জীবনের অর্দ্ধাঙ্গভাগী হইবে। কিছুতেই নয়। তাহা আমার জীবন থাকিতে কখনই হইবে না। নানা লোকে আমায় নানা কথা বলিতে লাগিল, আমি কিন্তু অচল, অটল। আমার সেই এক প্রতিজ্ঞা।

এই বিবাহে মামা মত দিয়াছেন। বিবাহের দিনও আর বড় বেশী নাই। ইতিমধ্যে একদিন আমি মামাকে না বলিয়া দেশে চলিয়া আসিলাম। মামা আমাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ঘোসেদের বিপিনের নিকট আমার বাড়ী চলিয়া আসিবার কথা জানিতে পারিয়া শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে চিঠি লিখিলেন। আমি তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম, "মাতাঠাকুরাণীর ব্যায়রামের খবর পাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছি। আপনি বাসায় না থাকায় আপনাকে বলিয়া আসিতে পারি নাই। মাতাঠাকুরাণী আরোগ্য হইলেই আমি ওখানে যাইব।" বস্তুতঃ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে যথার্থই তখন আমার মাতাঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া হইয়াছিল। কিছুদিন সেবাশুশ্রূষা করিবার পর, তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। বাড়ীতে আমার আর মন টিকিল না। পুনর্ব্বার সেই এক রাশ দুঃখপূর্ণ হৃদয় লইয়া মামার নিকট ফিরিলাম।

তখন অন্যত্র কিরণের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিন আমি পাটনায় গিয়া পৌছিলাম, সেই দিন কিরণের বিবাহ। মামাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি আমার উপর কিছু রুষ্ট হইয়াছেন। তথাপি তিনি একবার আমায় বলিলেন, "হাঁগো, শুনলাম যে, তুমি না কি কিরণের উপর রাগ ক'রে তাদের বাড়ী আর যাও না? ছিঃ, চিরদিন কি আর রাগ ক'রে থাক্‌তে হয়? তুমি এখানে এসেছ অথচ তাদের বাড়ী যাও নাই শুনলে তারা মনে কষ্ট ক'রবে না? তোমার সেই কপাল কেটে যাওয়ার সময় কিরণ কত পরিশ্রম ক'রেছিল--কত রাত্রি জেগেছিল বল দেখি? আর আজ কি না রাগ ক'রে কিরণের—সেই উপকারিণী কিরণের বাড়ীতে যাও না? ইহাপেক্ষা আর অধিক দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?"

মামার কথা ঠেলিতে পারিলাম না। অগত্যা কিরণের বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিবাহ-বাড়ীতে খুব ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। আশে পাশে চারিদিকে লোকে পরিপূর্ণ। কোথাও স্কুলের কতকগুলি বালক মিলিয়া ছোটখাট একটী Meeting (মিটিং) করিয়াছে।—কোথাও ছ-দশজন বামুন বসিয়া বিবাহে আজ কত চাউলাদি পাইবে তাহার হিসাবে মত্ত—কোথাও দুই একটী নব্য-গব্য সভ্য-বাবু চসমা চক্ষে পায়চারী করিতেছেন। কোথাও ইংরাজী বাজনার দল বাজনা বাজাইয়া লোকের নিকট মান লইবার জন্য ব্যস্ত—আর কোথাও বা একটী দেশী ঢুলী হাত-পা-মাথা নাড়িয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মনে করিতেছে, বোধ হয় লোকে ইংরাজী বাজনা ফেলিয়া আমার বাজনা শুনিতেছে। আবার হয় ত তাহার একজন সমকক্ষ ঢুলী আসিয়া আর একটা ঢোল লইয়া বাজনা জুড়িয়া দিল। এইরূপে বাজনার শব্দে বিবাহ-বাড়ী হাস্য-মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি আমার অশান্তি-হৃদয়খানি লইয়া সেই সমূহ আনন্দরাশির মধ্য দিয়া কিরণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, সদরে কিরণের পিতা ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে বরের বসিবার স্থান রহিয়াছে। তখনও বর পৌছায় নাই।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই প্রথমে কিরণের সহিত আমার

দেখা হইল। আমাকে দেখিবামাত্র কিরণের চক্ষু দুইটী ছলছল করিয়া আসিল। সে আমার কাছে দৌড়িয়া আসিয়া আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত রাগ ভুলিয়া গেলাম। ক্রমে কিরণের অধরে আমার অধর মিশিল। আমি সস্নেহে কিরণকে একটী চুম্বন করিলাম। ইহাই আমার প্রথম ও শেষ চুম্বন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি কিরণের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথা মনে পড়িল। আমি তাহার হাত ছাড়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় কিরণ যেন আমায় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর তাহার বলা হইল না। আমি সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া বরাবর বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, মামা বাসায় নাই। তখন আমি একটী বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই হইল না; বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলাম। এইরূপে যখন দশটা বাজিল, তখন শুনিলাম, বিবাহ-বাড়ীতে ধুমধাড়াক্কা পড়িয়া গেল। কোথাও রমণীগণের আনন্দ-সূচক হুলুধ্বনি—কোথাও ইংরাজী বাজনা—কোথাও দেশী ঢাক ঢোল সানাইয়ের বাদ্য—আর কোথাও রসুনচৌকির সুমধুর স্বরলহরী চারিদিক মাতাইয়া তুলিল। আমি ভাবিলাম, এইবার বিবাহ হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শুনিলাম, চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কিরণের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া দেখি, কিরণের পিতা কপালে হস্ত দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অন্যান্য লোকেরা যেন কাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া গোলমাল করিতেছে। আমি কিরণের পিতার ক্রন্দনের কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া তাড়াতাড়ি সেই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম। পৃথিবী যেন তখন প্রবলবেগে আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি তাহাদের একজন লোককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "বিবাহের কিছু পূর্ব্বে কিরণকে বাড়ীতে দেখিতে না পাইয়া সকলে তাহাকে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে একজন বাগানের পুষ্করণীতে তাহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া এখানে আনিয়াছে।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, আমারই দোষে নিশ্চয় কিরণ এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে। যাও কিরণ তুমি আজ জীবনের পরপারে! আমি পাপী, তাই তোমার মৃত্যু দেখিয়াও এখনো আমার দেহে জীবন-বায়ু বর্ত্তমান।

তারপর?—তারপর আমার কি হইল তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। সেদিন বিবাহের রাত্রিতেই আমার সমস্ত সুখ-সাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন এই একক-জীবন আমার সেই অতীত দুর্ব্বুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে!!।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রধান।

তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।

মনে করি আমি হই বিশ্বপতি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মোর শৌর্য্য ভাতি,
পড়ুক ছড়ায়ে কি দিবা কি রাতি,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি আমি হই ধনবান,
হউক ঐশ্বর্য্য সুমেরু-সমান,
কুবেরে নেহারি কীটানু প্রমাণ,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি মোর এ তৃণ-বাটিকা,
হ'ক রাতারাতি স্বর্ণ-অট্টালিকা,
সেবুক অসংখ্য সেবক-সেবিকা,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি মোর হ'ক রূপ অতি,
সবে ভাবে ভ্রমে যেন রতিপতি,
আর, বুদ্ধিটি হউক যেন বৃহস্পতি,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি আমি হই বেদব্যাস,
কিম্বা সেক্ষপীর কবি কালিদাস,

অথবা হোমর বাল্মীকি স্বভাব,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি স্ত্রীটি হ'ক সাধ্বীসতী,
রূপে যেন লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী,
তার, পতিপদে হ'ক অচলাভকতি,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি হও কুলীনের শ্রেষ্ঠ,
হ'ক শত পুত্র গ্রাজুয়েট বেষ্ট,
তা'দের বিয়ে দিয়ে পাই টাকা চেষ্ট চেষ্ট,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি কোন কালে মোর কুলে,
একটিমাত্র কন্যা না জনমে ভুলে,
আমি, বরকর্ত্তার * * * * *,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি চিরযুবা রই আমি,
অজর অমর যাবৎ অবনী,
আর, স্ত্রীটী হ'ক মোর আজীবন যদি,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি সব যা'ক ছারেখারে,
যত শত্রু মোর আছে চরাচরে,
আমি, সদানন্দে ভাসি সুখের সাগরে,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটী চাই।
মনে করি মোর হ'ক দুটা পক্ষ,
ভেদি অন্তরীক্ষ ধাই গ্রহকক্ষ,
ত্রিলোকের তত্ত্ব নেহারি প্রত্যক্ষ,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি আমার আছে যত দেনা,
(শুধিবার যাহা নাহি সম্ভাবনা)
মহাজনগণ কখন চা'বে না,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।

মনে করি আমি সদা সর্ব্বক্ষণি,
রাত্রি হ'ক দিবা, দিবা হ'ক যামি,
চতুর্ব্বর্গ হ'ক করতলগামী,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।
মনে করি আমি সময় সময়,
সবে হ'ক মূর্খ আমি জ্ঞানময়,
আমি নয় করি হয়, হয় করি নয়,
কিন্তু তেমনটি হয় কই যেমনটি চাই।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

কলুষনাশিনী মাতঃ! এস মা কালিকে
হৃদয়-আসনে তুমি! এ ঘোর বিপাকে।
বিষম সঙ্কটশরে
দিশেহারা ভবঘোরে,
হতেছি মা ক্ষণে ক্ষণে অশান্ত-জীবনে,
হৃদয় চকিত মাগো! এ সংসার রণে,
অভয়চরণে স্থান
দয়াময়ী কর দান,
নতু' চায় মম প্রাণ সংসার সমরে,—
সদাই বিষাদ-বহ্নি দহিতে অন্তরে।
শান্তিদাত্রী তুমি মাতঃ
হও হৃদে বিরাজিত,
সংসার অনল-জ্বালা করহ নির্ব্বাণ
এস মা করুণাময়ী করুণা নিদান।
সন্তাপিত এ জীবনে
শান্তিবারি বরষণে,
শান্ত কর মাগো তায়, জুড়াক্ পরাণ,—
শোক তাপ দুখ জ্বালা হোক্ অবসান।

জীবন লতিকা মোর
পরিয়াছে মায়া-ডোর,
জড়ায়েছে আশা ফাঁস সংসার প্রয়াসে—
প্রাণ যায় বুঝি মাগো সংসার প্রবাসে।
মরি হায় এ সংসারে
ভাসি যবে দুঃখনীরে,
শান্তিহীন কলেবর অশান্ত জীবন,
উদাস পরাণ মোর হয় গো তখন।
হাঙ্গর কুম্ভীর ব্যাধি
ভবস্রোতে যে অবধি,
ভাসিতেছে, সদা রত গ্রাসিবারে তায়,—
কেমনে যাই গো আমি সাগর-সীমায়।
এ দীন দাসেরে মাগো
যদি তুমি পায়ে রাখো,
তবে ত নিস্তার পাই সংসার-সাগর,—
আদি অন্ত নাহি যার অপার দুস্তর।
অকূল পাথার তায়
উত্তাল তরঙ্গ হায়—
কি করি জননী আমি নাহিক উপায়,
ভাসিতেছি ভবস্রোতে হয়ে নিরুপায়,—
যায় যায় প্রাণ যায়
কি করিব হায় হায়,
রাখ মা চরণে তুমি দিয়া পদাশ্রয়,—
এ দাসের এ মিনতি সংসার আলয়।
আর সেই পরদেশে
মহাকাল যবে এসে,
লয়ে যাবে নিজ স্থান, করিবে পীড়ন,
পাই যেন জননী গো! ও রাঙ্গাচরণ।

শ্রীহরিদাস দাস।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—এখনও আমাদের নিকট ১৩০৯ সালের সম্পূর্ণ আলোচনা" কয়েক সেটমাত্র অবশিষ্ট আছে, এ বৎসর যাঁহারা গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য কেবলমাত্র ১৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে, সত্বর টাকা পাঠাইয়া গ্রহণ করুন, ফুরাইলে আর দিতে পারিব না। পুরাতন গ্রাহকগণ এখনও যাঁহারা ১৩১০ সালের মূল্য দেন নাই, তাঁহারা যেন এই মাসের মধ্যেই তাঁহাদের দেয় মূল্য পাঠাইয়া উপহার গ্রহণ করেন, নতুবা উপহার আর পাওয়া যাইবে না। কি নূতন, কি পুরাতন গ্রাহক সকলেই সত্বর হউন।

অভিযোগ।—হাওড়া বক্‌ল্যাণ্ড ব্রিজের সিড়ির নীচে রাত্রে আলো থাকে না, যাত্রীগণের যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হয়, অধিকন্তু এ স্থানটী বড়ই বিপদসঙ্কুল, অধিক রাত্রে যাতায়াতের সময় যাত্রীগণকে জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। সংবাদপত্রে এ বিষয়ের অনেক আন্দোলন হইয়াছে, তথাপি ইহার কোনও প্রতিকার হয় নাই। হাওড়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহোদয় এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

স্মরণার্থ দান।—বগুড়া সেরপুরের অন্যতম দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺ মোহনলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ উক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় বগুড়া জেলার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহিত একটী অস্ত্র চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে। পরহিতব্রত বদান্যবর রমণীবাবু এ কার্য্যের জন্য সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সাধারণ কার্য্যে রমণীবাবু মুক্তহস্ত। আশা করি, হাওড়ার দরিদ্র আলোচনা সমিতি ও তথা হইতে প্রকাশিত "আলোচনা" পত্রিকার প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে।

লাইট রেলওয়ে।—হাওড়া আমতা ও হাওড়া শিয়াখালা লাইট রেলওয়ের ভাড়া অত্যন্ত বেশী ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া, গ্রামবাসীগণ ভাড়া কমাইবার জন্য ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন। এখন শুনিতে পাওয়া যায়, উক্ত রেলওয়ের এজেণ্ট মার্টিন কোম্পানী নাকি ভাড়ার হার কিছু কমাইতে চাহিয়াছেন? এরূপ করিলে কোম্পানী সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, সন্দেহ নাই।

নূতন সংবাদ পত্র।—আমরা "মহিমা" নাম্নীয় একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কয়েক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। মহিমার কাগজ ও ছাপা ভাল, নানাপ্রকার আবশ্যকীয় সংবাদাদিতে "মহিমার" কলেবর পূর্ণ হইয়া থাকে, অল্পমূল্যে এরূপ সংবাদপত্র প্রকাশ বড়ই সুখের বিষয়। সুযোগ্য হস্তে ইহার সম্পাদন ভার ন্যস্ত হওয়ায় আশা করা যায়, "মহিমা" নিজগুণে লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

জেলার উন্নতি।--হাওড়া জেলার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, এখানে পূর্ব্বে একমাত্র মাসিক পত্র "আলোচনা" ব্যতীত আর কোন সংবাদ বা সাময়িক পত্র ছিল না, এক্ষণে "হাওড়া হিতৈষী" নামক একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও ট্রুথ Truth নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ হইতেছে। আবার শুনা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্টের সেই চিরপরিচিত "গ্রামবাসী" নাকি পুনঃ প্রকাশিত হইবে। হাওড়ার পক্ষে ইহা কম সুখের বিষয় নহে।

নূতন থিয়েটার।—কলিকাতায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এবার "ইউনিক থিয়েটারের আসর বসিয়াছে। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেদিন "ইউনিকে" তারাবাই নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এই থিয়েটার সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক অভিনয় করিয়া থাকেন, ম্যানেজার ও সত্ত্বাধি-কারী বাবু জি, এম, মল্লিক মহাশয়ের বিনীত স্বভাবে আমরা সেদিন বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি। তারাবাই, পৃথ্বী ও অপরাপর কয়েকটী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই থিয়েটার সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা করি।

মহিমাময় মহিমারঞ্জন।—আলোচনার পাঠকগণ যদিও এই দয়ার অবতার রাজাবাহাদুরকে জানেন, তথাপি আজ আমরা তাঁহার দানশক্তির কয়েকটী বিষয় আপনাদের গোচর করিব। রাজা শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী একজন খ্যাতনামা দানশীল জমীদার, রঙ্গপুর কাকিনা ইঁহার রাজধানী। ইনি নিজ প্রতিষ্ঠাবলে এবং বংশ পরম্পরাগত ধর্ম্মানুরাগে বঙ্গদেশের সকল জমীদারগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। অমানুষিক ক্ষমা ও দয়ার আধার বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই মহিমারঞ্জনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর প্রাচীন হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর জমীদারীর অধিকাংশ কার্য্যই দেখিয়া থাকেন। কুমার বাহাদুর সর্ব্বাংশেই পিতৃপথানুবর্ত্তী এবং পবিত্র বংশের বংশ মর্য্যাদা রক্ষণে সমর্থ। রাজা মহিমারঞ্জন এইরূপ উপযুক্ত পুত্র, ও পৌত্র লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন কিন্তু বিগত বৎসর তাঁহার পৌত্রটী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় রাজা বাহাদুর কথঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। রাজা মহিমারঞ্জন বাহাদুর দানধর্ম্মে ও সদনুষ্ঠানে সদা মুক্ত হস্ত, ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে তিনি চারি হাজার টাকা দান করিয়া জেলার জলকষ্ট প্রপীড়িত গ্রাম সমূহে কূপাদি খনন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মহিমারঞ্জনের মহিমা কেবল যে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রদর্শিত হয়—তাহা নহে, তিনি সর্ব্বজাতিতে সমদয়াবান। সেদিন "ইসলাম প্রচারক" নামে একখানি মুসলমান সাময়িক পত্রে তিনি এককালীন ৫০\ টাকা দান করিয়া যথার্থ সাহিত্যসেবীর পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ আদর্শ ধার্ম্মিকপ্রবর রাজার সহবাসে থাকিয়া কর্ম্মচারীবর্গও ধার্ম্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছেন। তাঁহার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় একজন শিক্ষিত এবং ধর্ম্মভীরু লোক। মহিমারঞ্জনের মহিমার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া শেষ করা অসম্ভব। আমাদের "আলোচনা" আজ তাঁহার ন্যায় মহানুভব রাজার কথঞ্চিৎ মহিমার বিষয় উল্লেখ করিয়া ধন্য হইল। এক্ষণে ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা, এরূপ প্রাতঃ-স্মরণীয় দানশীল জমীদার মহোদয়কে তাঁহার পুত্র পরিজনের সহিত চির শান্তিসুখে রক্ষা করুন আর দরিদ্র আমরা যেন চিরকাল তাঁহার আশ্রিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারি।

কেশ তৈল।—ভাল জিনিষের আদর চিরকাল সমভাবেই থাকে, হাজার অনুকরণ হইলেও আসল জিনিসের কাটতি কমে না, কারণ গুণের আদর এখনও আছে। পুরাতন চিনাবাজারের এম, এল, বসু কোম্পানীর "লক্ষ্মী-বিলাস" তৈল ভারত-বিখ্যাত, ইহার গন্ধও যেমনি মনোহর, গুণও তাদৃশ। আমরা সভ্য মহোদয়গণকে নকল ছাড়িয়া বহুদিনের বিখ্যাত, মহোপকারী "লক্ষ্মীবিলাস তৈল" ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা জেলা ত্রিপুরার বোয়ালিয়া সাধারণ হরিসভা হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার" নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে অনেক বিষয় এই পুস্তকে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে লেখকের ভক্তিভাবের ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বোয়ালিয়ার সাধারণ হরিসভা এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া সাধারণের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা এই সভার ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।

পরিষদে সাহায্য।—মুর্শীদাবাদ লালগোলার স্বদেশহিতৈষী স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য ৩০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এবং রাজা বাহাদুর আশা দিয়াছেন, উক্ত সভায় তিনি প্রতি বৎসর ঐ পরিমাণে সাহায্য করিবেন। আমাদের দেশে এরূপ সাহিত্যানুরাগী রাজার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল, কারণ সাহিত্যসেবায় উৎসাহদাতা রাজা অধুনা বঙ্গদেশে নিতান্তই বিরল হইয়াছে—তাই আমাদের মাতৃভাষার এত দুর্দশা। দেশে রাজা অনেক আছেন, অর্থও অনেকের আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধন সম্বন্ধে এরূপ সাহায্য পূর্ব্বে আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের দানই সকলের আদর্শ, রাজা বাহাদুর তুল্য সাহিত্যসেবীগণকে চিরকাল এইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিলে নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গল হইবে ও তাঁহার অর্থ যথার্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। রাজা বাহাদুর দীর্ঘজীবী হইয়া মনের সুখে এই সৎকার্য্যে সহায়তা করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।